সমরেশ বসু

সাহিত্য সংস্থা ১৪-এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৪এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৫৯

গণেশ বসু

প্রচ্ছদ মুদ্রন
জুপিটার প্রিণ্টিং
৮এ, নবীন পাল লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
কমল মিত্র
নব মুদ্রন
১বি রাজা লেন,
কলিকাতা-৯

এইমাত্র খাতাটা পড়ে শেষ করলাম। এটাকে একটা পাণ্ডুলিপি বলা যায় না। কারণ দোকানে কিনতে পাওয়া সাধারণ খাতা যেরকম পাওয়া যায়, সেরকম একটি খাতায়, উদ্দেশ্যহীন ভাবে, কিছু কথা লেখা আছে। কোন গল্প বা উপন্যাস না, একজন তার জীবন সম্পর্কে, যখন যেরকম সময় পেয়েছে বা মনের যখন যেরকম অবস্থায়, কিছু কিছু কথা লিখে রেখেছে। পড়লেই বোঝা যায়, অনেকেই যেমন আত্মজীবনী লেখার তাড়নায় (?) কাগজ কলম গুছিয়ে, বেশ কোমর বেঁধে শুরু করে, ভাবখানা তেমনই যে, একটি বৃহৎ কাণ্ডকারখানা না ঘটিয়ে ছাড়বে না। অর্থাৎ, নিজের জীবন সম্পর্কে সে এমনিই আত্মতুষ্ট গৌরবান্বিত বা নিজের অভিজ্ঞতায় সে এমনিই বিস্মিত আবিষ্ট, অপরকে আর না জানিয়ে পারছে না। সেইজন্যই, এ ক্ষেত্রে 'তাড়না' শব্দটি আমি ব্যবহার করছি।

আমাদের এই বর্তমান সময়েও, অনেক নাম করা পত্র-পত্রিকার পাতা খুললে, প্রায়ই অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের, এমন কি মহিলাদেরও আত্মজীবনী-বিষয়ক নিবন্ধ, ঘটনাবলী ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। সেইসব লেখার মধ্যে না আছে জীবনের কোন প্রকৃত রঙ বা রস, না আছে বর্তমান যুগের মানুষকে কোন প্রকার কৌতূহলিত বা উৎসাহিত করার বিষয়বস্তু। অধিকাংশের রচনার রীতি ও ভঙ্গি, একশো বছরের পুরনো বস্তা পচা, জীবনের বিষয়ও তেমনই বিবর্ণ।

মুসকিল হল এই, এইসব ব্যক্তি বা মহিলারা, তাদের নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতাকে নিজেরাই অনেক বড় করে দেখেছে। এবং অধিকাংশ অনভিজ্ঞ সম্পাদকেরা সেগুলো ফলাও করে ছাপাচ্ছে, তার

একমাত্র কারণ, সম্পাদকদের ধারনা, এতে তার পত্রিকার মর্যাদা বাড়ছে। কারণ, এ সব আত্মকাহিনী যারা লেখে, প্রথমতঃ তারা কোন এক যুগে হয়তো কয়েকটি দুঃসাহসিক কাজ করেছে অথবা বিশেষ কোন পরিবারে, যে ভাবেই হোক, যোগাযোগ ছিল। সে পরিবার কোন এক যুগে বাঙলা দেশে বিশিষ্টতা লাভ করেছিল। এবম্বিধ বহু কারণেই, এইসব আত্মজীবনীগুলো লেখা হয়ে থাকে।

সব থেকে যা লজ্জার বিষয়, এবং ধিক্কারেরও, এইসব আত্মজীবনীগুলোতে, আসল ব্যক্তিটিকে কখনো ফুটিয়ে তুলতে পারে না। কারণ নিজের বিষয়ে সাতকাহন প্রশংসামূলক ঘটনা ও কাহিনী, মিথ্যাশ্রয়ী কিছু গল্প এদের সম্বল। নিজের অন্যান্য বিষয়ের ঘটনা সযত্নে গোপন করাই এদের বৈশিষ্ট্য। শুধু এদেরই বা বলি কেন, এটা আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য। আমরা যাদেরই আত্মজীবনী পাঠ করি, তারা অধিকাংশ ব্যক্তিই মহৎ, অকুতোভয়, নির্ভীক, উদার, মিষ্টস্বভাব, পরোপকারী, যাকে বলে একেবারে সর্বগুণান্বিত। এদের জীবনটা আলোয় আলো, কোথাও এক ফোঁটা অন্ধকার নেই, পাপ নেই। এ লোকগুলো নিজেরা বোঝে না, বোঝানও হয়নি। যে রিয়ালাইজেশন থেকে, মানুষ আত্মজীবনী লেখবার প্রেরণা বোধ করে, এগুলোর কোনটারই সে মূল্য নেই। এগুলো এক ধরণের পুরনো ফ্যাশান। জীবনের আলো অন্ধকারের যে গভীর সংগ্রাম, এগুলোর মধ্যে তার কোন চিহ্নই নেই।

আমাদের দেশেই, মিথ্যাবাদীদের বিদ্রূপ করে বলা হয়, 'সত্যবাদী যুধিষ্ঠির।' কিন্তু এইসব আত্মজীবনীকার বা এমনি জীবনীকারেরাও জানে না, যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতার মূল কোথায় নিহিত ছিল। 'সত্য বৈ মিথ্যা বলিবে না' পাঠ গ্রহণ করে, এ দেশের ব্যক্তিরা যে পরিমাণ মিথ্যে কথা বলে থাকে, পৃথিবীতে তার তুলনা পাওয়া কঠিন। সেটা আমাদের ইতিহাসের ভাঙা গড়া

থেকেই প্রমাণিত। কোন বিশেষ ব্যক্তির মন্তব্যের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু 'যুধিষ্ঠিরের মত সত্য কথা কহিতে শিখিও', এ কথা সচরাচর শেখানো হয় না, তা অতীব কঠিন। অথচ এই যুধিষ্ঠিরই, নিজের স্ত্রীকে পণ রেখে, জুয়া খেলেছিলেন। জীবনীকার কোথাও একথা গোপন করার প্রয়োজন বোধ করেননি। তারই ফলে যুধিষ্ঠির চরিত্র মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। কেন না, সাধারণ মানুষ, তার নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার কিছু পরিচয় এইসব চরিত্রের মধ্যে দেখতে পেয়েছে। সেইজন্যই, সেই চরিত্রের উত্তরণ, সংগ্রাম ও সাহস, পাঠককে মুগ্ধ, বিস্মিত, উৎসাহিত করেছে।

এখানকার পত্র-পত্রিকার জীবনীকারদের লেখা পড়লে মনে হয়, সেই জীবনটি কোন কালের স্পর্শে ছিল না, কালাকালের ঊর্ধ্বে। দেব-চরিত্রেও যদি কিছুমাত্র কলঙ্কের দাগ থেকে থাকে, এরা একেবারে নিষ্কলঙ্ক।

যাই হোক, এত কথা বলবার প্রয়োজন বোধহয় ছিল না। প্রয়োজন হয়ে পড়ল ময়লা, মলাট-শিথিল সেলাই, একটি খাতার মধ্যে এলোমেলো কিছু কথা পড়ে। হাতের লেখা তেমন কাঁচা না। অথবা নিয়মিত লেখার অভ্যাসে যে হস্তাক্ষরে বিশেষ একটি পাকা ছাপ পড়ে, তেমনও না, খুব অল্প সংখ্যক, দু'একটা শব্দ বাদ দিলে, বানান ভুল প্রায় নেই। এ খাতায়, যে তার নিজের সম্পর্কে এলোমেলো ভাবে কিছু ঘটনা, ব্যক্তিদের বিষয় লিখেছে, একসময় সে পড়াশুনা করেছে, বোঝা যায়।

এটা কোন ডাইরি বা আজকাল যাকে দিনলিপি বলে, তা নয়। হঠাৎ হঠাৎ কয়েক পাতা লেখা। তার কোন তারিখ নেই। কখনো কয়েক পাতা ছেড়েই চলে গিয়েছে। আবার হঠাৎ লেখা হয়েছে।

যেদিন লিখেছে, বিশেষ করে সেদিনেরই কোন ঘটনা যে ব্যক্ত হয়েছে, সে রকম কিছু না। অথবা তার আগের দিন কিছু ঘটেছে বলেই যে খাতা কলম পেড়ে বসেছে, তাও না। হয়তো ছ'মাস কিংবা দু'বছর আগের কোন ঘটনা লিখতে শুরু করেছে।

এরকম লেখার দরুনই বোঝা যায়, বেশ ভেবে-চিন্তে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিজের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করবার ইচ্ছের চেষ্টা কোথাও নেই। এ খাতা কেউ কোনদিন পড়বে, এ আশঙ্কা সে একবারও করেনি, ছাপা তো অনেক দূরের কথা। আমি 'আশঙ্কা' বললাম এই কারণে, খাতার এক জায়গায় লেখা আছে। 'ছি ছি খাতাটা যে খাটের পাশতলায় ছোট টিপয়টার ওপর পড়েছিল, একটুও খেয়াল ছিল না। হিমাংশু খাতাটা হাতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী, এটা সংসারের হিসেবের খাতা নাকি?" আমি তখন বুধনকে মাছের ঝালে কতটুকু কী মশলা দিতে হবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। হিমাংশুর হাতে খাতাটা দেখে, আমার গায়ের মধ্যে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল? মনে হল, আমার গায়ে জামা কাপড় নেই, একেবারে খাটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, হিমাংশুর হাত থেকে খাতাটা ছিনিয়ে নিলাম। বললাম, "সব কিছুতে হাত দেওয়া কেন? একটু চুপচাপ বসতে পার না?" হিমাংশু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমি খাতাটা বগলে চেপে, বুধনকে মাছের ঝালের মশলার কথা বলে দিলাম। হিমাংশু বলল, "এমনভাবে খাতাটা ছিনিয়ে নিলে, যেন ওতে কোন গুপ্তধনের সন্ধান লেখা রয়েছে।" আমি হাসলাম, কোমরে গোঁজা রুমাল বাঁধা চাবি নিয়ে, খাতাটা আলমারীতে রাখতে রাখতে বললাম, "তা একরকম বলতে পার।" মনে মনে ভাবি, না ছাই। তবে গুপ্তধন না হতে পারে, গুপ্ত বিষয় তো বটে। এ খাতা কেউ কোনদিন পড়ুক, তা আমি চাই না।

আমার যেমন মাথা খারাপ, তা-ই এসব ছাই-ভস্ম আমি লিখি। তবু—ছাই-ভস্ম যাই হোক। এ খাতা যেন আমার মরার পরে, আমার চিতাতেই যায়।'

খাতার এক কোণে কথাগুলো লেখা রয়েছে। কোন তারিখ নেই। কবে কোন দিন, কখন হিমাংশু খাতাখানি খাটের পাশতলা থেকে তুলে নিয়েছিল, কোন উল্লেখ নেই। যে-দিন লিখেছে, তার কয়েক মাস আগের ঘটনা হতে পারে, কয়েকদিন আগের হতে পারে, আগের দিন রাত্রেরও হতে পারে। এই লেখাটুকু থেকেই বোঝা যায়, খাতার বিষয় কারোকে জানাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার ছিল না। নিজের জীবনের বিষয় ছাপা তো দূরের কথা।

নিজের জীবন সম্বন্ধে তার কোথাও কোন গৌরব বোধ নেই। নানান সুখ-দুঃখ, কখনো কিছু বিচিত্র বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা আছে। খাতার একটা অংশে অনেকখানি লেখা, অনেকগুলো পাতা জুড়ে। এ অংশটা-ই খাতার লেখার সব কিছুতে ভরে আছে। কোথাও পরিষ্কার করে, নিজের কোন পরিচয় লেখা নেই। বাবা মা বা দু'একটি আত্মীয়-স্বজনের কথা লেখা আছে। তা থেকে, কোথাকার পরিবার বংশ পরিচয়, কিছুই জানবার উপায় নেই। কেবল তার নিজের দুটি নাম উল্লেখ করা আছে।

খাতাটি যার লেখা, সে একটি মেয়ে। এখন সে সম্ভবতঃ জীবিত নেই, থাকলেও এখন সে কোথায় আছে, তার পরিচিতদের কেউ জানে না।

মেয়েটি দেহোপজীবিনী। এককথায় এটাই তার পরিচয়। তথাপি আমি প্রারম্ভেই যে-সব কথা বলেছি আত্মজীবনীকারদের বিষয়ে, মনে হতে পারে, তাদের সঙ্গে একটি দেহোপজীবিনীর কী-ই

বা তুলনা থাকতে পারে। একটি দেহোপজীবিনীর নিজের লজ্জাক
জীবনের বিষয়ে কী-ই বা গোপন করার থাকতে পারে।

কিছুই না। তথাপি, এই খাতারই এক জায়গার লেখা ইতি
পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে। 'হিমাংশুর হাতে খাতাটা দেখে, আমার গায়ে
মধ্যে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। মনে হল, আমার গায়ে জামা কাপ
নেই, একেবারে খালি গায়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছি।' অথ
হিমাংশু তার দেহেরই একজন ক্রেতা! তথাপি খাতাটা এব
হিমাংশুর প্রসঙ্গে, এরকম কথা লেখার মানে খুবই গভীর এব
অর্থমূলক। যে-দেহ সে হিমাংশুদের কাছে মেলে ধরে, সেই দেহট
সম্বন্ধে তার অনুভূতি মৃত। কিন্তু তার আর আর একটি দেহ আছে
দেহোপজীবিনী হওয়া সত্ত্বেও যে-দেহে মন বলে বস্তু আছে, অনুভূতি
তীব্রতা এবং গভীরতা আছে, লজ্জা-সংকোচ-ভয়, সবই আছে
খাতাটি সেই দেহেরই কতগুলো ছিন্ন ছবি। সেইজন্যই খাতাটা
কাউকে কখনো দেখাতে চায়নি। এ খাতায় তার মনের কথা, তা
ইচ্ছা-অনুভূতির কথা, তার রাগ ও ঘৃণার কথা, সুখ ও দুঃখের কথা
যে-সব মানবিক বোধগুলো দেহোপজীবিনীদের আছে বলে সমা
সংসার জানে না, সেইসব বোধবিষয়ক কথা খাতায় লেখা আছে।

লেখিকার ইচ্ছেনুযায়ী, খাতাটা আমারও পড়া হয়তো উচি
হয়নি। কিন্তু এই ঔচিত্যবোধ কোন কাজের না। লেখিকা
আপত্তির যে আসল কারণ ব্যক্ত হয়েছে, অন্ততঃ আমার দিক থেকে
সে রকম কোন ধারণাই সৃষ্টি হয়নি। আমি বিচলিত হয়েছি। ক
পেয়েছি। আবার অবাক হয়েছি। মুগ্ধও হয়েছি।

আমার এক সরকারী কর্মচারী বন্ধু খাতাটি আমাকে দিয়েছেন
তিনি বিশেষ বিভাগে, বিশিষ্ট উচ্চপদে চাকরী করেন। নানা
ঘটনা তাঁর মুখে শুনে থাকি। একদিন তিনি এই খাতাটি নি
এলেন। খবরের কাগজে মোড়া, শাড়ির ফালি দিয়ে বাঁধা। বললে

'ভয় নেই, কোন নতুন লেখকের পাণ্ডুলিপি পড়তে দিয়ে আপনাকে বিরক্ত করছি না। আমার মনে হয়, এটা পাণ্ডুলিপি নয়। খাতাটা পেয়ে, আমি কয়েক পাতা উল্টেছিলাম। তারপর মনে হল, এটা আপনাকে পড়তে দিই। আপনারা তো সামান্য ব্যাপারেই, অনেক সময় অসামান্য ব্যাপার আবিষ্কার করতে পারেন। এতেও যদি পারেন, দেখবেন। তবে এটুকু আপনাকে বলতে পারি, এ খাতার মালিক সম্ভবতঃ মারা গেছে। না মারা গেলেও, সে যে কোথায় আছে, কেউ বলতে পারে না।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। একজন জলজ্যান্ত মানুষ পৃথিবী থেকে কোথায় হারিয়ে গেল, কেউ বলতে পারছে না?'

সরকারী কর্মচারী বন্ধুটি বলেছিলেন, 'তাই তো মনে হচ্ছে। যে মানুষ নিজেকে লুকিয়ে বেড়ায় অথবা যদি নিজের অস্তিত্বকে কেউ নষ্ট করতে চায়, সেইসব মানুষের পাত্তা কেউ দিতে পারে না।'

একদিক থেকে কথাটা মানলেও, আইন ও বাস্তবের দিক থেকে কথাটা মেনে নেওয়া যায় না। তাই আমি একটু হেসেছিলাম। আমার বন্ধুটি সে কথা বুঝেছিলেন, বলেছিলেন, 'আপনার মনের কথা বুঝতে পারছি। কেউ যদি আত্মহত্যা করে বা আত্মগোপন করে, প্রয়োজনে তার দায়িত্বটা সরকারের বিশেষ বিভাগকে নিতেই হয়।'

আমি বলেছিলাম, 'তা ছাড়া, একজন অপরাধীও আত্মহত্যা বা আত্মগোপন করতে চাইতে পারে। তাদের আটকানো বা খোঁজটাও একটা বিশেষ কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। অবশ্যি আমি জানি না, এ খাতার মালিক কে, তার কি ঘটনা বা বিষয়, যার জন্য আপনি ওরকম কথা বললেন।'

বন্ধুটি আমাকে খানিকটা আশ্বস্ত করার ভঙ্গীতে বলেছিলেন, 'এ খাতার মালিক কোন অপরাধ করে ফেরার হয়নি। এটা যেমন

কোন নতুন লেখকের লেখা পাণ্ডুলিপি নয়, তেমনি এটুকু আপনাকে আশা দিচ্ছি, কোন অপরাধীর রোজনামচা বা ডকুমেণ্টস্ আপনার হাতে তুলে দিইনি। এই খাতার মালিক বেঁচে আছে কিনা, এ সন্দেহ কেন করেছি, অথবা বেঁচে থাকলেও সে কোথায় আছে, কেউ বলতে পারবে না কেন, সবই খাতার মধ্যে শেষ পর্যন্ত যা লেখা আছে, পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন।'

তারপর আমরা অন্যান্য বিষয়ে অনেক কথা বলেছিলাম। খাতা ও খাতার মালিককের বিষয় আমরা আর আলোচনা করিনি। বন্ধুটির কথায় বুঝতে পেরেছিলাম, তিনি চাইছিলেন, ও-বিষয়ে তাঁকে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে খাতাটা পড়েই যেন তখনি আমার কৌতূহল মেটাবার বা যা বোঝবার বুঝে নিই।

খাতাটা কয়েকদিন দৃষ্টির বাইরে পড়েছিল। হঠাৎ কয়েকটা জরুরী কাজ পড়ে যাওয়ায় খাতাটার কথা মনেই ছিল না। সম্ভবতঃ মনে পড়ত না, যদি টেবিলের অন্যান্য অনেক কাগজপত্রের মধ্যে এক ফর্মা গ্যালি প্রুফের খোঁজ না পড়ত। সেটা খুঁজতে গিয়ে অন্যান্য কাগজপত্রে চাপা পড়া, খবরের কাগজে মোড়া পুরনো শাড়ির পাড় দিয়ে বাঁধা খাতাটা চোখে পড়ল। তখনই আমার বন্ধুটির কথা মনে পড়ে গেল, এবং খাতা খুলে দেখবার কৌতূহল হল।

প্রুফের গ্যালিগুলোর যথাবিহিত ব্যবস্থা করে, আমি খাতাটার বাঁধন খুলতে বসলাম। খুলে দেখলাম খাতাটা বাঁধানো, মোটা খাতা। সেলাই শিথিল হয়ে গিয়েছে। তবে পাতা খুলে যায়নি।

খাতাটা খুলে দেখলাম, প্রথম পাতায় লেখা আছে 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণ।' তার নিচে লেখা আছে 'ভগবান' একেবারে নিচে, এক কোণে লেখা আছে, 'বিজলী চৌধুরী।' তার পাশে আরো কিছু লেখা হয়েছিল, কিন্তু এমনভাবে কাটা, কিছুই পড়া যায় না। হয়তো কোন জায়গার নাম ছিল, বিশেষ কোন গ্রামের বা শহরের। তারিখ

নিশ্চয়ই ছিল না। কারণ বিজলী নামে, এ-খাতার লেখিকার তারিখ লেখার অভ্যাস যে একেবারেই ছিল না, বোঝা যায়, তার সমস্ত খাতার কোথাও তারিখের বালাই নেই। মানুষের জীবনে অনেক সময়েই বিশেষ কোন দিন আসে, যা নানান কারণেই স্মরণীয়। বিজলীর ছাড়া ছাড়া লেখার মধ্যে, তার জীবনের অনেক চমকপ্রদ ঘটনা লেখা হয়েছে, যা হয়তো স্মরণীয়। কিন্তু সেখানেও তারিখের উল্লেখ নেই।

জানি না সে মারা গিয়েছে কিনা, তথাপি এটা ঠিক, তার জীবন-কালের মধ্যে কোন ঘটনাকেই সে যেন তারিখ দিয়ে চিহ্নিত করতে চায়নি। সবই তার কাছে যেন সমান হয়ে গিয়েছিল। সবই স্মরণীয় অথবা কোন কিছুই স্মরণীয় নয়। আর প্রথম পাতাটা দেখে মনে হয়েছিল, এক বিশেষ সংস্কারে অনেকেই যেমন প্রথমে ঈশ্বর বা অন্য কোন দেবতার নাম উল্লেখ করে, স্মরণ করে, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বা ভগবানের কথা বোধহয় সেইজন্যই লিখেছিল।

পরের কয়েক পাতা কেবল হিজিবিজি। একে হাতের লেখা মক্‌শো করা বলে কিনা জানি না। এমন তো হতে পারে, খাতার পাতা খুলে, কলম দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে যখন যে কথা মনে এসেছে, তাই লিখেছে, কেটেছে, লিখেছে। সব কথাই যে কেটে দিয়েছে, তা না। যেমন এক জায়গায় বড় বড় অক্ষরে মোটা করে লিখেছে, 'আশা নিরাশা' কিম্বা 'ন্যাকামি দেখলে গা জ্বালা করে।' একথাটা সেরকম মোটা করে লেখা না। হিজিবিজির মধ্যে অনেক কথা, কাটা-কুটি ছাড়া যা লেখা আছে, পর পর একটা তালিকা করলে, মনে হয় একটা চরিত্র আর একটা পরিবেশের অনেকখানি ধরা যায়। যথা—

'ফুলবাসিয়া বাড়ীওয়ালি।'

'জয় বাবা তারকেশ্বর।' মোটা বড় অক্ষর।

'শখ দেখে বাঁচি না···।' পরের কথা কেটে দেওয়া।

'মরিব মরিব সখী, নিশ্চয় মরিব।'

'চন্দন ধূপ দীপবর্তিকা ও আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া গৃহটি অপরূপ দেখাইতেছে।'

'পুসি আমার পুসি। পুসির বিয়ে দেব।'

'শীতলপ্রসাদ।'

'৩২৭ – ৪৮ = ২৭৯।'

'লাগ্ ঝমাঝম।'

'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

'তারাশঙ্কর।'

'না'

'চন্দ্রনাথ।'

'চুলে গুঁজে বেলফুল ধরে আনে অলিকুল।'

'পণ্যাঙ্গনা পণ্য হইয়াছে অঙ্গ যাহার অর্থাৎ বেশ্যা বা গণিকা—ইতি বিজলি চৌধুরী।'

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।' বড় মোটা অক্ষর।

'বিলিতি মদ সোডা কুড়ি বোতল হরিদাসীর পান।'

'জর্জেট।'

তালিকা আরো বাড়ানো যায়। বাড়িয়ে লাভ নেই। কয়েক পাতা ব্যাপী, অনেক লেখা, অনেক হিজিবিজি কাটাকুটির মধ্যে এ ধরণের কথা যেন এক একটি দ্বীপের মত জেগে আছে যাতে একটি মানুষের পরিবেশটা এবং তার পরিচয়টা যেন অনেকখানি ফুটে উঠেছে। এসব ছাড়াও কোন জায়গায় লেখা আছে, 'ভগবান সবই হিতে বিপরীত হল।' 'মা বোধহয় মরে যাবে।' 'না কিছুই ভাল লাগে না' ইত্যাদি।

তারপর দু তিন পাতা কিছুই লেখা নেই। যেন মনে হয়, পাতা ওলটাতে গিয়ে খেয়াল ছিল না। লেখা অলস ভাবের, এই ভাবে শুরু হয়েছে :

'ভাল লাগলেই তো হল না। ভাল লেগে তো এই ফল হল। নিজেকে ফতুর করে দিয়ে, সব বেচে বিক্রি করে, দেবদাসের খোঁজে যেতে হল। আজকালকার বেশ্যারা এসব ফাঁদে আর পড়তে চায় না। তবে বেশ্যাই হই আর যাই হই, মেয়েমানুষ বড় বোকা। তালে তালে সবসময় অন্য চিন্তা। যা নাই তার চিন্তা লোকেরা ভাবে, চন্দ্রমুখী বুঝি কেবল বইয়ে লেখা বেশ্যা মেয়েছেলের কথা। মোটেই না। শরৎচন্দ্র মহাশয় লোকটি বেশ বোঝদার। বোধহয় ওরকম দেখে থাকবেন। 'খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে কাল হ'ল এঁড়ে গরু কিনে।' বেশ্যাদের ভালবাসা হল তাঁতির এঁড়ে গরু কেনা। ওই করে সব মরে বেশ্যা মরে জারে।

'এই তো, ছট পুজোর কয়েকদিন আগে রেণুটার কি হাল হল। বছর দুয়েক ধরে, কোথা থেকে এসে জুটেছিল এক ছোঁড়া। ছেলেটা লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকের বাড়ীর। বিয়ে থাও নাকি করেছিল। বৌয়ের সঙ্গে বনাবন্তি ছিল না। রেণুর কাছে এসে, ছেলেটা নিজে মজল। রেণুও মজল। বেশ্যার মজামজি কি বাপু। বাবু এসেছে। তাকে খুশী কর। বাবুর প্রাণে ফুর্তি যোগাও। শরীর বলে কথা আজ আছে কাল নেই। যা পার, গুছিয়ে-গাছিয়ে নাও।

'তা না। ওই সেই, চিরকাল ধরে তলে তলে সাধ। মনের মত পুরুষ, ঘর সংসার, ছেলে মেয়ে। তা আবার হয় নাকি। একবার যখন বেশ্যা হয়েছ, ওসব সাধ রেখে লাভ কী। সবাই মুখে অস্বীকার করবে। তলে তলে চাইবে। এক একজনের আবার ওটা বাতিক। যেমন রেণুর। খাতায় নাম লিখিয়ে ব্যবসা করতে এলি। অথচ কথায় কথায় "এ জীবন ভাল লাগে না, তেমন দিন

এলে চলে যাব। এ লাইন ভাল, কেউ মাথার দিব্বি দিয়ে বলেনি। খারাপ লাইনে আসা কেন!

'সেটা একটা কথা বটে। আসা কেন? নিজের ইচ্ছায় আর কে আসে। যখন আসে, তখন কি আর মেয়েরা কেউ বুঝতে শেখে। শিখলেও উপায় থাকে না। বাধ্য হয়ে লাইনে আসে। আমার তো মনে হয়, টাকার জন্য মেয়েরা এ লাইনে আসে। কিন্তু যে বয়সে সে টাকার ধার ধারে না, তখনই তাকে লাইনে নিয়ে আসা হয়। বিয়ে হয়ে গেছে, একটু বয়স-টয়স হয়েছে, এমন মেয়ে এ লাইনে কম! ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরতে না পরতেই খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

'কাল বইটা দেখে মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। যেমন সমাজের মরণ, তেমনি বেশ্যাদের মরণ। দেবদাসের সঙ্গে পার্বতীর বিয়ে হল না। তার জীবনটা এ রকম হল। দেবদাস মরল। চন্দ্রমুখীকেও মজিয়ে গেল। সেইজন্য রেণুটার কথা মনে পড়েছে। এখনকার দিনেও যে এমন ঘটে, তাতেই অবাক লাগে সেই ছেলেটা যখন প্রথম এল, রেণুকে সব উজার করে দিল। এইসব পুরুষও খারাপ। বৌয়ের সঙ্গে না হয় বনিবনা নেই। ঘর-সংসার, আরো পাঁচজন আছে তো। নিজেকে শক্ত রেখে, সব দেখে শুনে চলতে হয়। তা না। ধ্যান জ্ঞান সব একখানে।

'রেণুকে তখন কী সুখী মনে হত। রোজ সেই ছেলেটা আসে। রেণুর অন্য বাবুরা আর দরজা খোলা পায় না। পেলেও রেণু কাউকে ঘরে নিত না। তার বাঁধা বাবু আছে। অমন বাঁধাবাবু অনেকের থাকে। তা বলে, তার মুখ চেয়ে সন্ধ্যে থেকে সেজে বসে থাকতে হবে। কিছুক্ষণ খেটে নে। মনের মানুষ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। আখেরের কথা তো ভাবতে হবে। এসব সতীপনা ভাল লাগে না। মনের মানুষ এসে কি তোমার শরীর উল্টে পাল্টে

দেখবে, কারোর সঙ্গে শুয়েছিলে কিনা। বলে, 'কত হাতী গেল তল, মশা বলে কত জল।'

'মুখে বল্‌ছি' মনে মনে খুব হিংসা হত। রেণু সেজেগুজে বসে থাকত, আর ওর মনের মানুষ আসতে দেরী করত। রেণু ঘর বার করে মরত। কেউ এলে তাকে ফিরিয়ে দিত। দেখলে রাগ হত। ঠোঁট উল্টে মনে মনে গালাগাল দিতাম, 'মাগীর ন্যাকামো দেখলে গা জ্বালা করে। জাত বেজাতের হাজার গণ্ডা পার করে, এখন ইয়ে শুদ্ধি হচ্ছে।' আমি একা না, আমরা কয়েক ঘরের মেয়েরা একত্র হয়ে বলতাম। রেণুকে গালি দিতাম। তারপর যখন ছেলেটা আসত, তখন হিংসায় বুকটা ফেটে যেতে। যেন আমাদের বুকে আগুন জ্বালিয়ে, ওদের মান ভাঙাভাঙি শুরু হত। মান ভাঙাভাঙির পরে খাওয়া দাওয়া চলত। সারারাত্রি রেণুর ঘরে কথা। রাত পোহালে, ওর ঘরের দরজা খুলতেই, সব থেকে বেশি দেরি হত। রাত শেষ করে শুত কিনা তাই।

'রেণু নিজের হাতে রান্না করত। ছেলেটা কোন দিন বাজার করে নিয়ে আসত। রেণু নিজেও বাজার করত। অনেক সময় রান্না করে, ছেলেটাকে খাওয়াত। রেণু শাড়ীতে গাছকোমর বেঁধে, খুন্তি হাতে রকে বেরোলে বুকটা ফেটে যেত। বেশ্যা-বাড়িতে, এসব দেখলে কার ভাল লাগে। যেখানকার যা। তা না, আমরা দশটা নাগর নিয়ে কারবার করছি, আর একজন মাগ-ভাতারের ঘরকন্না করছে। তার জন্য এ জায়গা কি দরকার। ছেড়ে গেলেই হয়। রান্না বান্না, সিনেমা থিয়েটার, আজ এখানে, কাল সেখানে বেড়াতে যাও না। তারপর শোনা গেল, রেণু আর এ লাইনে থাকবে না; ছেলেটার সঙ্গে অন্য কোথাও গিয়ে থাকবে। সংসার করবে। আমাদের কী রাগ। মনে মনে রেণুকে পা দিয়ে পিষতাম। দাঁত দিয়ে ছিঁড়তাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হল।

ছেলেটার যা সম্বল ছিল, সব শেষ করে ফেলল। রেণু সোহাগ করে বলল, "আমর যা আছে. তাতেই চলে যাবে।" দেখ পীরিত। তা-ই কখনো হয়। তারপরেই মেজাজ খারাপ। মন কষাকষি। মন কষাকষি থেকে ঝগড়া। চোপাবাজীর পরে, হাতাহাতি। ছেলেটা টাকা পয়সা নষ্ট করল, শরীরটাও রাখতে পারল না। যখন চলে যাবে ঠিক করল, তখন রেণু বলল, ও সঙ্গে যাবে। একে বলে মরণ। তবে কথা কী, রেণুর নাম খারাপ হয়ে গেছল। বাজারও খারাপ হয়ে গেছিল। বাড়িওয়ালা শীতল প্রসাদ তো অনেকদিন থেকেই চাইছিল, রেণু ঘর ছেড়ে দিক। বাড়িওয়ালি ফুলবাসীয়া দিন রাত রেণুকে গালাগালি দিত। বাজার খারাপ না হলেও যে রেণু এ লাইনে থাকত, তা না। রেণু যখন থেকে এ লাইনে এসেছে, তখন থেকে ভেবেছে, সুযোগ পেলে ছেড়ে যাবে। সে কথা আমাদের অনেকবার বলেছে।

'আমরা মনে মনে হেসেছি। ভেবেছি, সাত মন ঘিও পুড়েছে, রাধাও নেচেছে। কিন্তু তা ই সত্যি হল। রেণু চলে গেল। টাকা পয়সা অনেক খরচ হয়ে গেছল। গহনাগাটিও সামান্য ছিল। দুজন মানুষ অনেকদিন বসে খেয়েছে। কারোর কোন রোজগার ছিল না। অথচ ঘরের ভাড়া তিন শো টাকা। চাকরের মাইনে, ধোপা নাপিত, ঘর করতে গেলে কত খরচ। কলসীর জল কতদিন থাকে।

এমন না যে, মনের মানুষটি রইল, রেণু যতটা পারল রোজগার করল। তেমন মজে গেল, এ লাইনে তা-ই হয়। রেণুর মত কে আবার সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যায়। এমন হতভাগ্য বেশ্যা দেখিনি বাপু। কত মেয়ে তো মনের মানুষকে সেই ভাবে রেখে দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, মনের মানুষের সঙ্গেও অনেককে লাইন ছেড়ে যেতে দেখেছি। সেটা মনের সঙ্গে মনও বটে, টাকার সঙ্গে টাকাও বেঁধেছে। তাতে পাওয়ানা বেশী। আখের পাকাপোক্ত। আর রেণুটা গেল সব ছেড়েছুড়ে। খাট আলমারি রেডিও গ্রামোফোন

সব বিক্রি করে দিল। যা নগদ আর অল্প কিছু সোনা-দানা নিয়ে গেল। কেবল দেখলাম, দামী দামী শাড়ি জামাগুলো বিক্রি করল না। ভাল ভাবে যদি না-ই থাকতে পারবে, তবে দামী শাড়ি জামা নিয়েই বা কী করবে!

'ওটা আলাদা কথা। আমাদের কারোকে ভাল শাড়ি পরতে দেখলে এমন হিংসে হয়, নিজেরটা ছেড়ে দিতেও তেমনি বুক টাটায়। কিন্তু রেণু যে তার লোকের সঙ্গে, এমন যোগিনীর মত চলে গেল, তাতেও তাকে মনে মনে হিংসে করেছি। ভাবলে এখনো মনটা চির চির করে জ্বলে। তবে এখন হিংসের থেকে, রেণুর কথা ভাবলে, মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে যায়। রেণুর জন্য না, নিজের জন্য। আজকাল কোথায় কেমন আছে, কে জানে। ওর সেই লোকটা বেঁচে আছে কিনা, তা-ই বা কে বলবে। কিন্তু কেমন ভাবে রেণু চলে গেল।

'আমাদের সেই একরকম। কোন দিকে একটু রকম ফের নেই। কোনোদিন দু'টাকা রোজগার বেশি, কোনোদিন দু'টাকা কম। সিনেমা, থিয়েটার বেড়াতে যাওয়া, হোটেলে খেতে যাওয়া, আর সব কিছুর মূলে পুরুষের সঙ্গে শোয়া। রাত হলে রাতে, দিনেও লোক আসে। তা-ই সকাল থেকেই ঢুকঢুক মদ খাই। না খেলে পারব-ই বা কেন। এ তো একটা জেদের মত। কত আসবে এস। কত কাবু করতে চাও দেখি। ছেড়ে দেব না। (খুব শরীর খারাপ থাকে কিংবা মাসিক হয়, সে আলাদা।) তা নাহলে কেউ ছাড়ি না। তবে দুপুরের খাওয়া হয়ে গেলে সুবিধা। এইসব নিয়ে থাকি। না হয় তো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করি। অন্য বাড়ির মেয়েদের নিয়ে কুচ্ছো করি। কারোকে ভাল বলতে ইচ্ছে করে না। কেবল যে আমার মন রাখে, তার মন রেখে কথা বলি।

'এ সব থেকে রেণু বেরিয়ে গেছে। কোথায় কী ভাবে আছে, কে

জানে। কাল দুপুরে সিনেমা দেখে, চন্দ্রমুখীর জন্য রেণুকে খুব মনে পড়ছে। রাধারাণী দিদি বলছিল, ওটা নাকি অনেক কাল আগের বই যে লোকটা দেবদাসের পার্ট করেছে, তার নাকি আগে খুব নাম ছিল। আর শরৎচন্দ্রের নাম তো অনেক আগে থেকেই জানি। কতকাল আগের লেখা বই। এখনো এমন ঘটনা ঘটে। তাই ভাবি গেরস্থ ঘরের বৌয়েরা তো অনেক কিছুই করে। ঘর সংসার স্বামী পুত্রের জন্য। বেশ্যারাও যে এমন করতে পারে, তা কি সবাই জানে। বইয়ে পড়লেও লোকেরা হয়তো বিশ্বাস করে না। এত যে হাজার গণ্ডা লোক সারা পৃথিবী ঝেঁটিয়ে দিন রাত আমাদের কাছে আসছে, তারাও কি বিশ্বাস করে! আমার মনে হয়, এমনি লোকেরা যদি বা বিশ্বাস করে, তারা করে না। তারা আমাদের কাছে আসে, যা দরকার, তাই সেরে চলে যায়। কী পেল তারাই জানে। যাদের একটু তেমন বুদ্ধি শুদ্ধি আছে, তারা জানে, এখানে পাবার কিছুই নেই। আর আমরা জানি, কী দিয়েছি, কী দিইনি। অথচ আবার এখানেই, এমন ঘটনাও ঘটে। বাইরে চেনা চেনা গলা শোনা যাচ্ছে। কমলার সেই লোকটি এল বোধহয়, এখনই…।'

এখানেই এই পরিচ্ছেদের শেষ। যেমন শেষ না লিখেই, লেখিকা উঠে গিয়েছিল, আর শেষ করা হয়নি। যেখানে ছেড়ে গিয়েছে, সেখানেই এই পরিচ্ছেদের ইতি। তথাপি, সমগ্র পরিচ্ছেদ থেকে, একটি আশ্চর্য ছবি, পরিবেশ, চরিত্র আর মনোভাবের কথা জানা যায়। কে এক বিজলীর লেখা এ পরিচ্ছেদ না পড়লে, একটা বিষয়ে আমি কখনো জানতে পারতাম না। শরৎচন্দ্র এখনো এতখানি বাস্তব? চন্দ্রমুখীর ভালবাসা আর ত্যাগকে এতকাল মিথ্যে বলেই জেনে এসেছি। কখনো কখনো, আধুনিক সাহিত্য সমালোচকরাও তাই লিখেছে। এখন বুঝতে পারি, এই সব সমালোচকেরা অধিকাংশই পুঁথির কীট। জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠ্য লিখে, নিজেদের এরা সর্বজ্ঞ জ্ঞান করে বসে আছে।

শ্রীকান্তের পিয়ারী বাঈজীকে যখন প্রথম দেখা গেল, তখন তবু একরকম। তারপরে আর কোথাও তাকে একটি বিশেষ পেশার স্ত্রীলোক বলে মনে হয় না। চন্দ্রমুখী তা না। সে বেশ্যা, তার কোন ভাঁড়ামী নেই। গৃহস্থ সতীদের ভাঁড়ামী যাকে বলে। কিন্তু মনে মনে একটা সুপ্ত বাসনা চন্দ্রমুখীরও ছিল। তা সংসার না, সম্ভবতঃ সন্তান না, একটু ভালবাসা। এক্ষেত্রে চন্দ্রমুখী একলা ভালবেসেই শেষ। সেটা এমন আশ্চর্যের ব্যাপার কিছু না। সংসারে অনেক স্বাভাবিক মানুষের মধ্যেই এই লক্ষণ দেখা যায়। বিশেষ একজনকে পাবার জন্য, সে সব কিছু ছাড়ে। পিয়ারী বাঈজী, উচ্চাঙ্গের বাঈজী চরিত্র, চন্দ্রমুখীতে নেই। চন্দ্রমুখী অনেক স্বাভাবিক রেণুর মত। রেণুর আকাঙ্ক্ষা ছিল। চন্দ্রমুখীর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়নি, দেবদাসের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিল।

যাই হোক, এ সব প্রসঙ্গ আমার আলোচ্য না। আমি খাতাটা পড়ে মুগ্ধ হলাম। নিজেদের জগতের একটি মেয়ের কথা বলতে গিয়ে, নিজেদের মনের কথাগুলো সে সরল ভাবে প্রকাশ করেছে। পাতা উল্টে দেখি, তেমনি দু তিনটি পাতা ছেড়ে গিয়েছে। আবার হঠাৎ লিখতে আরম্ভ করেছে। পর পর সাজানো ঘটনা যে না, বোঝা যায়, হঠাৎ পরবর্তী প্রসঙ্গ দেখেই। একটি করুণ আর মর্মন্তুদ পরিচ্ছেদ।

'এত বড় একটা পুরুষ মানুষ কেমন করে আমার সামনে লজ্জা-টজ্জা সব ভুলে গেলেন, বুঝতে পারি না। কী ভয় যে আমার করছিল। এখনো সব কথা যথেষ্ট মনে আছে। বাড়িওয়ালী ফুলবাসিয়ার ঘরে মেয়েটিকে দেখেই সব কথা যথেষ্ট মনে পড়ছে। তখন কি ছাই জানতাম, মা আমার সর্বনাশ করছে। মায়ের সেই যে

এক পাতানো ননদ জুটেছিল, সেই মায়ের কানে দিনরাত মন্ত্র দিত। সে যে কী ছিল জানতাম! বলতে গেলে বুড়ো বয়সে মাকে সে-ই খারাপ রাস্তায় নামিয়েছিল।

'এক এক জনের যেমন থাকে, একটু বয়সেই যেন শরীরে রূপ ফোটে। মায়ের সেই রকম। আমার আগে কম করে তিনটি না চারটে ভাই বোন মরেছিল। সেই হিসেবে আমি মায়ের একমাত্র সন্তান। বাবা মারা গিয়েছিল আমার সাত বছর বয়সে।

'বাবাও মরল। পিসির আনাগোনাও বাড়ল। কলকাতার বাইরে একটা ছোট শহরে আমরা থাকতাম। বাবা সেই শহরের একটা ছোট অফিসে কাজ করত। সরকারি অফিস না। তবে সরকারি লোকেরা নাকি সেই অফিস চালাত। মুগা তসর কর্পাস সুতোর নানান রকমের জিনিস সেখানে তৈরি হত। অনেক মেয়েরাও সেখানে কাজ করত। বাবা সেখানে মেয়েদের কাজের হিসাব লিখত বরাবরই শুনেছি, বাবা খুব ভালমানুষ, নিরীহ গোছের মানুষ ছিল।

'পিসির নাম নন্দ। নন্দরাণী টানি হবে বোধ হয়। মা নন্দ দিদি বলে ডাকত। আর পিসি বাবাকে দাদা বলে ডাকত। শহরে মেয়েদের পাড়ায় গিয়ে না থাকলেও, তার ব্যবসা ছিল ওই রকম সবাই জানত। আবার পাড়ার লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তাও বলত বাড়ি বাড়ি দুধ দিত। তার গরু গোয়াল ছিল। সে যে কুটনির কাজ করত কেউ জানত না।

'পিসির কৌঁসলানিতেই মা রাস্তা ধরল। তবে শহরের পাড়ায় না, বাড়িতেই। আমার চোখে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করলে কী হবে আমি সাত আট বছর বয়সেই সব বুঝতে পারতাম।

'এখন আরো ভাল করে বুঝতে পারি। পাড়ার মধ্যে বলে সন্ধ্যেবেলা মায়ের কাছে কেউ আসত না। একটু বেশি রাত হলে আসত। যারা আসত, তারা সবাই তো চেনাশোনা লোক। শহরে

যাদের নাম ধাম আছে, তারাই সব মায়ের কাছে আসত। তাদের অনেককেই আমি চিনতাম। আমাদের গলি থেকে বেরোবার মোড়ে পুকুর আর পিটুলি গাছ। পিটুলি গাছের ধার ঘেঁষে ইটের গাঁথনিয়ালা টালির ঘরটা ছিল ডাক্তারখানা! সবাই তাকে নবকেষ্ট ডাক্তার বলত। বাবার অসুখে অনেকবার দেখতে এসেছে। বড়লোকেরা কেউ তাকে ডাকত না! সবাই বলত, সে নাকি হাতুড়ে। কোথাকার হাসপাতালে নাকি কম্পাউণ্ডার ছিল। ওষুধ চুরি করে ধরা পড়ে, তারপরে চাকরি চলে গেছে। সে আসত মায়ের কাছে।

'তাই বা কেবল বলি কেন। ডাক্তার যদি বলতে হয়, শহরের বাজারের কাছে বড় রাস্তার উপরে অতবড় যার ডাক্তারখানা, সেই নীলমণি ডাক্তারকে আমাদের বাড়িতে আসতে দেখেছি। অমন সুন্দর ভদ্রলোকের মত চেহারা। রিক্সা, গাড়ি ছাড়া চলে না। যখন দেখবে, তখনই তার ডাক্তারখানা ভরে রুগী। মায়ের কাছে তাকে আসতে দেখে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। প্রথম যেদিন শহরের নাম করা নীলমণি ডাক্তারকে আমাদের ছিটেবেড়ার আগলের ধারে, গামবিল গাছের তলায় দেখেছিলাম, ভয় পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, মায়ের বুঝি তবে কোন ভারী রোগ হয়েছে। না হলে এত বড় ডাক্তার আসবে কেন?

'আমি তখন ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এঁটো হাত ধুচ্ছিলাম। পিসির হাতে ব্যাটারির বাতি জ্বলছিল। তাতেই দেখতে পেয়েছিলাম, নীলমণি ডাক্তার কোঁচা ধরে সাবধানে পা ফেলে উঠোনের দিকে আসছে। তার হাতের আঙুলের আংটিতে ঝলক দিচ্ছিল। আমি এঁটো হাতে অন্ধকারে হাঁ করে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাকে কেউ দেখতে পায়নি। পিসির পেছু পেছু ডাক্তার মায়ের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল।

'আমাদের দুটো ঘর ছিল। দুটোই ইটের দেওয়াল, টালির চাল। যে ঘরটার সঙ্গে ছোট মত রান্নার চালা ছিল, আমি সেই ঘরের

মেঝেতে শুতাম। যখন থেকে মায়ের ঘরে লোক আসিআসি শুরু হয়েছিল, তখন থেকে আমি সেই ঘরেই শুতাম। একলা না, পিসি এসে আমার কাছে বসত। ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত বকবক করত, আর ভাজা মদ খেত। এখনো পর্যন্ত বুঝি না, ভাজা মদ কেন বলত? দেখতাম, বোতল থেকে এলুমিনিয়ামের বাটিতে মদ ঢেলে আগুন জ্বেলে গরম করে নিচ্ছে। তারপর চায়ের মত চুমুক দিয়ে দিয়ে খেত। তার নাম বুঝি ভাজা মদ। কে জানে ছাই। বলত, "গা হাত পা বড্ড কামড়াচ্ছে। একটু ভাজা মাল খাই।" খেতে খেতে আগড়ম-বাগড়ম বকত। কথার কোন মাথামুণ্ডু ছিল না। আমি কিছুই বুঝতাম না। আমার বোঝবার মত কথা সে বলত না। আমার কাছে এসে বলতে হত। তাই ইচ্ছে করলে আমার পাশে শুয়েও পড়ত। শুয়ে শুয়েও বক বক করত। পাড়ার লোকজনকে যখন গালি দিয়ে কথা বলত, তখন আমার বেশ মজা লাগত। "ওই যে বাপভাতারি পুনি মুখ নেড়ে নেড়ে কথা বলতে আসে, ভেবেছে আমি ওর বিত্তান্ত সব জানি নে। যিদিন ফাঁস করব, সিদিন বুঝবে।" পুনি আমাদের পাড়ার দুলির মায়ের নাম ছিল। পিসি খুব লাগসই গালি দিতে পারত। কোন ব্যাটাছেলেকে গালি দিতে হলে বলত, "মেয়েমেগো।" আমার মায়ের মুখে কোনদিন অমন একটা খারাপ কথা শুনিনি। মা তো এমনিতে খুব ভালমানুষ ছিল। পাড়াতেও মায়ের সঙ্গে কারোর ঝগড়া ছিল না। বরং মায়ের বেশ সুনাম ছিল।

সেই মা কেমন করে বেশ্যা হয়েছিল বুঝি না। পয়সার অভাব তো কত লোকের থাকে। তা বলে গরীব বিধবা ঘরে লোক ঢুকতে দেয় নাকি? পিসির ফোঁসলানি ছিল ঠিক। রাত পোহালে, মা বেটিতে কী খাব তারও ঠিক ছিল না। মাথার ওপরে একটা পুরুষ থাকা যে কত বড় কথা, সবাই বুঝবে না। তখন যদি আমার

দশ বারো বছরের একটা ভাইও থাকত, তা হলেও বোধ হয় মা নষ্ট হতে পারত না।

'এখন পুরুষে ঘেন্না। কিন্তু পুরুষ যে মেয়েমানুষের কত বড় শক্ত ঠাঁই, বুঝতে পারি। আজকাল দেখি কত মেয়েমানুষ, কত বড় বড় চাকরি করে কত লেখাপড়া শিখছে। তাদের কথা আমি ছাই কী বুঝি। কত জন্মের পুণ্যের ফল না জানি তাদের ভাগ্যে আছে। চাকরি করে, টাকা রোজগার করে, ইচ্ছে মতন বিয়ে করে। খেতে না পেয়ে শরীর তো বেচে না। তবে, অনেক অনাচারের কথাও শুনি সে সব আবার বেশ্যারও অধম। কেন বাপু, এত টাকা রোজ-গার করছ, দশজনে এত নাম করছে, এত লেখাপড়া শিখেছ, আবার দশটা পুরুষের সঙ্গে ঢলিয়ে বেড়ান কেন? কী জানি, লেখাপড়া শিখে চাকরি করলে তাদের রকমসকম আবার বদলেও বা যায়। নিজে কি আর এসব দেখতে যাই। লোকজন আসে, তাদের মুখেই শুনি। আমরা আর ওসব খবর জানব কোথা থেকে। এখনো পুরুষ মানুষের অভাব হয়নি। যত দিন শরীর গতর আছে, অসুখবিসুখ না থাকলে, তত দিন টাকাও আছে। রেবা যেমন বলে না, "দেখিস, গেরস্থ ঘরের ছুঁড়িরা আমাদের ভাতে মারবে।"

'জিজ্ঞেস করলে বলে, "ভয় তো পেট হবার। এমন তো না যে সব নিখাগীর মা। ইচ্ছে ষোল আনা। তা যা সব ওষুধবিষুধ আর ব্যবস্থা চালু হচ্ছে, তাতে আর কেউ আমাদের কাছে আসবে না॥"

'কথাটা কতখানি সত্যি, আমি বুঝি না। তবে এদিকে ওদিকে তো যাই। হোটেলে বারে, নানানখানে, এত যে মেয়ে দেখতে পাই সব তো আর আমাদের মত বেশ্যা না। কিন্তু তাদের চাল চলন পোশাক মদ খাওয়া ঢলানো সব দেখলে, আমারই এক একসময় তাক লেগে যায়। এসব বেশি বাড়াবাড়ি হলে, জল ভাত হয়ে গেলে, আমাদের ব্যবসাও একদিন উঠে যাবে। এমনিতেই তো সব বড় বড়

মানুষেরা আমাদের পেছুতে লেগেই আছে। যত দোষ নন্দ ঘোষ। আমাদের ব্যবসা তুলে দিতে পারলেই দেশটা যেন ভাল হয়ে যাবে। আর আন্ মেয়েমানুষের কাছে যাবে না, তাদের কথা ভাববে না। হয় তো তাই হবে। তা বলে কি মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করা বন্ধ হয়ে যাবে। হোটেলে, বারে, পার্কে, ময়দানে, গঙ্গার ধারে আমাদের পাড়ার মেয়ে আর কটা যাচ্ছে। তবু মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি কি আর চলছে না?

'তবে সেই তো এক কথা না। আমি বলি, যে মেয়েমানুষরা লেখাপড়া করেছে, তাদের ভাগ্য অনেক ভাল। অনেক পুণ্যের ফল তাদের আছে। আমাদের কাছে যারা আসে, তাদের অনেককেও তো জানি! যা আয় সবই বেশ্যায়ঃ নমঃ। তাদের মত লোকদের বৌ, যারা লেখা পড়া জানে তাদের মাথায় তো ভগবানের হাত ছোঁয়ানো আছে। লেখা পড়া জানে বলে, তবু শরীর বিক্রি করে তো খেতে হয় না। তারপরে যার যা মনে আছে সে তা করবে, তাতে কার কি বলার আছে। এমন যে আমাদের বেশ্যার শরীর, মরণ নেই, তারও খিদে আছে। ময়রায় নাকি সন্দেশ খায় না। কে আর তা দেখতে যাচ্ছে। মাথার দিব্বি তো দেওয়া নেই। খায় না, ঘেঁটে ঘেঁটে আর ভাল লাগে না, বিশ্রি লাগে। তা বলে কি, খিদের মুখে কোন সময় আর ভাল লাগে না। তাও কথা আছে। শরীর আর সন্দেশে তফাত আছে। মন বলে একটা কথা আছে তো! শরীর মনের বশ! যেদিক দিয়েই হোক। মন যদি না বলে তো না। হ্যাঁ বললে হ্যাঁ। শরীরের এইটাই যেন ধর্ম। এমনিতে বেশ আছি। নদীর জল নেমে চলেছে তো নেমেই চলেছে। আবার জোয়ারও আসে। জোয়ারের বেলা আলাদা কথা। যার যেমন, তার তেমন। কারোর কারোর একজন মানুষকে ভাল লাগে। সে খুব ভাল কথা। আমি তো আজ অবধি বুঝতে পারলাম না,

ঠিক কোনটিকে ভাল লাগে। অল্প বয়স, শান্ত শিষ্ট, হাসি খুশী, লাজুক, পেটে একটু বিদ্যা আছে কিন্তু জামাই জামাই ভাব, আমার ভাল লাগে। ময়রা হলেও, তখন সেই সন্দেশের জন্য খিদে পায়।

আবার রাণুর মত মেয়েও তো আছে। বিকেল থেকে সেজে-গুজে তৈরী। লোক না এলেই মাথা খারাপ। যত সময় যায় রাণুর মেজাজ ততই চড়ে। আমরা মনে করি, যতক্ষণ কোন খদ্দের না আসে, ততক্ষণ মদ ছোঁব না। বলা তো যায় না, কেমন লোক আসবে। মদ খাওয়া পছন্দ করে কিনা। তা ছাড়া, সন্ধ্যে-রাত্রে, সাত তাড়াতাড়ি নিজের গাঁটের পয়সা দিয়ে, মদ খেতেই বা যাব কেন? যাদের খাওয়াবার, তারাই খাওয়াবে। আর যদি দেখি, ওসবের নাম গন্ধ নেই, লোক আসছে, চলে যাচ্ছে, তখন দর নেবার জন্য গাঁটের পয়সায় মদ কিনতেই হয়। আদায় করেও নেওয়া যায়।

'রাণুর তা না। লোক না আসতে থাকলেই মাথা খারাপ। তাও বলি, মাঝে মাঝে এমন দিন কার না যায়, ঘরেতে ছুঁচোটিও ঢোকে না। মা লক্ষ্মী কি আর সব দিন সহায় হয়। তার ওপর আজকাল তো এমনিতেই নানা গোলমাল লেগে আছে। রোজই যেন হাঙ্গামা বাড়ছে, দিনকাল খারাপ হয়ে পড়ছে। আর হাঙ্গামা-হুজ্জোত বাড়লেই, আমাদের পাড়ার দিকেই যত নজর। যেন যত বজ্জাত লোকেরা সব আমাদের পাড়াতে এসেই ঘাপটি মেরে আছে। সেই জন্য রেবার কথা এক এক সময় সত্যি বলে মনে হয়। ওসব হাঙ্গামা-হুজ্জোত যারা করে, তারা আজকাল আর এ পাড়ায় আসে না। মেয়েছেলের যোগান তাদের অন্য জায়গা থেকেই হয়। সেই জন্য বাড়িওয়ালারাও আজকাল খুব হুঁশিয়ার হয়ে গেছে। সব মেয়েকে ডেকে ডেকে সাবধান করে দিয়েছে, "দেখে শুনে লোকজন ঘরে নেবে। কোন রকম বিপদে আপদে যেন পড়তে না হয়।"

'রাত দশটা বাজতে না বাজতে, রাণুর মাথা খারাপ। লোক না এলে, মন খারাপ হয়।

'রাণুর মত মাথা খারাপ কারোর হয় না। শুরু হবে মদ খাওয়া। একটু মদ খেয়েই, গালা-গালি দিতে আরম্ভ করবে বনোয়ারী বেচারিকে। বনোয়ারী ওর চাকর! সকলেরই একজন করে চাকর থাকে। একটি ঘর, একজন চাকর। ব্যবসা করতে গেলে, এ দুটি না হলে একেবারে অচল। বনোয়ারী বেচারী কী করবে। এত বড় একটা তাগড়া জোয়ান, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গালাগালি শুনতে থাকে। বনোয়ারী বাঙালী না হতে পারে, এ দেশে থেকে থেকে, আমাদের সঙ্গে কথা বলে বলে বাঙলা সবই বুঝতে পারে। বলতেও পারে। রাণুর যা মুখ খারাপ। কী খিস্তিই না করে বনোয়ারীকে। শুনে আমাদেরই কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে করে। রাণুর গালাগাল খেউড় শুরু হয়। আমরা নিজেদের দিকে চোখে চেয়ে, মুখ টিপে হাসি। জানি তো, তার পরেই কী ঘটবে। তবে সে হাসি যদি একবার রাণু দেখতে পায়, তা হলে আর রক্ষে নেই। তার চৌদ্দ পুরুষকে ধুয়ে দেবে।

'বনোয়ারী বারে বারে রাস্তায় যায়, যদি কোন লোক ধরে নিয়ে আসা যায়। চাকর হয়ে ওকে তখন দালালের কাজ করতে হয়। কিন্তু কপাল মন্দ থাকলে আর কি করা যাবে। খদ্দের তো আর রাণুর ইচ্ছে মতন আসবে না। গালাগালির পরে শুরু হয়, ঘরের মধ্যে থালা বাসন ছড়ানো। বনোয়ারী তাড়াতাড়ি সব সামলাতে যায়। গেলেই মারধোর। বেচারি বনোয়ারীকে মেরেধরে আর কিছু রাখে না। সে কী যে সে মার! মারতে মারতে রাণুর জামা কাপড়ের হুঁশ থাকে না। দরজা খোলা অবস্থাতেও ওর কাপড় চোপড় খুলে পড়ে। বনোয়ারীকে তখন নিজের মালকাইনের সরম রক্ষা করার জন্য মার খেতে খেতেই দরজা বন্ধ করে দিতে হয়।

দরজা বন্ধ হলেই সব ঠাণ্ডা। আর টু শব্দটি নেই। আমাদেরও শান্তি।

'পরদিন রাত পোহালে, দেখতে হয় বনোয়ারী বেচারিকে। সে আর মুখ তুলে আমাদের কারোর দিকে তাকাতে পারে না। মাথা নিচু করে বাজারে চলে যায়। মালকাইনের ফাই ফরমাস খাটে। আমাদের মধ্যে যারা একটু মুখফোড় মেয়ে, তারা ভয়ে রাণুর দরজার দিকে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কিরে বনোয়ারী, তোর মালকাইনকে ঠাণ্ডা করলি কী দিয়ে।" বনোয়ারীর সে কি লজ্জা। আমরা হেসে বাঁচি না। তার মুখে কথাটি নেই। যেন শুনতেই পায় না। চুপচাপ নিজের কাজ করে।

'তাই ভাবি, রাণুর মত মেয়েও আছে। তার সঙ্গে আমাদের কারোর মেলে না। ওটা যেন ওর ডাল ভাত খাবার মত একটা অভ্যাস। সন্ধ্যে হলেই লোক চাই। আমার মনে হয়, সে সময় ও টাকা পয়সা রোজগারের কথাও ভাবে না। একজন লোক এলেই হল। তারপরে আর সারা রাত্রের মধ্যে লোকজন না এলেও, রাণুর কোন আপত্তি নেই। বেশ হেসে গল্প করে সময় কাটিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে ভাবি, বনোয়ারীটা কী ভাবে। আমরা তো চাকরকে নিয়ে কিছু ভাবতেও পারি না। বনোয়ারীকে দেখে শুনে মনে হয়, বেশ খুশী। তবে একটা কথা কী, রাণুর সঙ্গে ওর যা সম্পর্কই থাকুক, আমাদের কারোকে কোন দিন অন্যথা দেখেনি।

'যাক গে ছাই, এখানে কত মেয়ের কত রোগ ব্যামো আছে রাণুর মত। ওসব কি ভেবে শেষ হয়। আমার মায়ের কথা বলি। কতরকম অভাবে অনটনেও তো মানুষ চালায়। সকলের ঘরে যে ছেলে হয় বা পুরুষমানুষ থাকে, এমন কথা নেই। তবু মা নষ্ট হয়েছিল। আমার যেন কেমন মনে হয়, আমার একটা ভাই থাকলে, মা তাকেও গ্রাহ্য করত না। তা না হলে, কেবল

টাকার জন্যই মা ঘরে লোক আসতে দিত, আমার বিশ্বাস হয় না। টাকার দরকার ছিল, না হলে অন্য আর কিভাবে পেট চলত, আমি জানি না। মায়ের অন্যরকম ইচ্ছেও ছিল। সে সব আমি বুঝতে পেরেছি। ইচ্ছে অনিচ্ছে বলে একটা জিনিস আছে। বোঝা যায় তো।

'প্রথম প্রথম বুঝতে পারতাম না। পিসি কেন আমাকে অন্য ঘরে নিয়ে শুয়ে বসে থাকে! বাবার ঘরে কেন আমাকে যেতে দেয় না! ও ঘরে একটা খাট ছিল। বাবা মরে যাবার পরে, আমি আর মা সেই খাটেই শুতাম। বুঝতাম না, মা কেন সন্ধ্যে হলেই সাবান দিয়ে গা ধুয়ে শাড়ি পরে। বাবা মরে যাবার পরে তো মা থান কাপড় পরত। দিনের বেলা সব সময়ে থান পরেই থাকত। সন্ধ্যে হলেই, শাড়ি জামা পরত। চোখে কাজল দিত। চুল আঁচড়ে খোঁপা বাঁধত। কপালে বা সিঁথেয় সিঁদুর পরত না। পায়ে আলতাও না। মায়ের তো এমনিতেই আঁটো সাঁটো মজবুত গড়ন ছিল। মুখ চোখের ছিরিও খারাপ ছিল না। ভাল খাওয়া পরা জুটত না বলে, আগে একরকম পাঁচি পাঁচি দেখাত। তবু লোকে বলত, "অমর্তর বউটি দেখতে বেশ। পিতিমের মত গড়ন পেটন।"

'বাবার নাম অমৃত ছিল। অমৃতলাল চৌধুরি। তা সে অমর্তের পিতিমের মতন বৌটি, পরে সত্যি পিতিমের মতনই দেখতে হয়েছিল। ঘুরিয়ে কাপড় পরে, জামা গায়ে দিয়ে নিজেকে দেখত, তখন সত্যি ভাল লাগত। দিনের বেলা পাড়ার মেয়েমানুষেরা বলত, "বিধবা হয়ে অমর্তের বৌয়ের রূপ খুলেছে।" এখন বুঝতে পারি, ওসব কথা আসলে ঠেস দেওয়া কথা। মুখের সামনে খোলাখুলি কেউ কিছু বলত না। তারপরে নীলমণি ডাক্তার সেই যখন এসেছিল, আমি ভাবলাম, মায়ের বুঝি কোন ভারী অসুখ করেছে। আমি অন্ধকার উঠোন দিয়ে, সেই ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখেছিলাম,

খাটের কাছে নীলমণি ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছে। মা তার গায়ের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। নীলমণি ডাক্তার মায়ের চিবুক ধরে মুখটা তুলে দেখছিল, আর বলছিল, "বাঃ খাসা! নন্দ তোমার ধুকড়ির মধ্যে এমন খাসা চাল ছিল, আগে কোন দিন বলনি তো।"

'পিসিকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। সে ঘরের অন্য দিকে ছিল্। আমি যে ছাই বাইরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, মায়ের অমন সাজা দেখছি। তা আর কে জানবে বা দেখবে! পিসি তো বাইরের আগলে শেকল জড়িয়ে, তালা মেরে এসেছে। আমি ছোটখাট মেয়েটা খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছি, কে আর দেখছে। নীলমণি ডাক্তারের কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম, আমার মায়ের গুণ গাওয়া হচ্ছে। বাইরে দাঁড়িয়ে আমি পিসির গলা শুনতে পেয়েছিলাম, "খাসা চালের খাসা দাম দিতে হবে ডাক্তারবাবু। অভাবে গেরস্থ ঘরের সোমত্থ বেধবা—বুঝতেই তো পারছেন।"

'নীলমণি ডাক্তার কোন জবাব না দিয়ে মাকেই দেখছিল। তার চওড়া মস্ত ফরসা মুখে হাসি। মায়ের চিবুক ধরে তেমনি দেখছিল। আর মা তখন লজ্জায় ডাক্তারের দিকে তাকাতে পারছিল না। চোখের তারা অন্য দিকে ছিল। তবে মায়ের ঠোঁটেও হাসি দেখতে পেয়েছিলাম। ডাক্তার মায়ের গলা জড়িয়ে সামনে টেনে নিয়েছিল। এমন ভাবে মায়ের গায়ে হাত দিচ্ছিল, আমি যে এতটুকু মেয়ে, আমারই যেন কেমন করছিল। ডাক্তারের কোঁচাটা মাটিতে লুটোচ্ছিল। একটু যেন টলছিলও। সেই সময়েই কী হল মা খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে ঠেলে দিয়ে আড়ালে সরে গিয়ে বলল, "দেখ তো নন্দদিদি, বাইরের উঠোনে ওটা কী। মানুষ না তো? নাকি শেয়াল কুকুর কিছু?"

'শোনা মাত্রই আমি অন্য ঘরের দিকে ছুট দিয়েছিলাম। অন্ধকার চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে দরজার কাছে পড়ে গেছলাম।

পিসি আমার পেছনে পেছনে ছুটে এসেছিল। চিৎকার করে বলেছিল, "অ মা, এ যে তোর মেয়ে। বলেই আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে গালের মাংসে অন্তর টিপুনি দিয়েছিল। খেঁকিয়ে বলেছিল, "ওখানে কী করছিলি, অ্যাঁ?"

'আমার কী যে হয়েছিল ভগবান জানে। পিসির ওপর আমি কোনদিনই খুশি ছিলাম না। তার ওপরে ওরকম গালে চিমটি, ধমক দেওয়া। আমার যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছল। পিসি যে সব গালাগালি দিত, আমি সেই সবই তাকে চেঁচিয়ে বলেছিলাম, "তবে রে বাপভাতারি মাগী, ছেলেভাতারি হারামজাদী, আমাকে তুই মারছিস? কুটনি। কুর্তি।" সেই দিনের আগে আমি নিজেও জানতাম না, ওসব গালাগালি আমি জানি! কারোকে ওসব বলতে পারি। তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না।

'পিসিও কম না। সে হল নন্দরাণী কুটনি। সে আমার চুলের মুঠি ধরে নেড়ে দিয়েছিল, পিঠে গুপ্ গুপ্ করে ঘুষো মেরেছিল, "অ মা কী মেয়ে গো, কী সব্বোনেষে কথা গো। এ মেয়ে যে জগত ডোবাবে।" কিন্তু আমি মার খেয়ে আরও মরিয়া। বুড়িটার হাত টেনে ধরে, এমন কামড়ে ধরেছিলাম, এক খাবলা মাংস তুলে নেবার দাখিল। তারপরে চেঁচামেচি চিৎকার। মা এসে আমাকে মেরেছিল! তবে নীলমণি ডাক্তার চলে যায়নি! মায়ের মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

'কত জানাশোনা লোক আসত মায়ের কাছে। নীলমণি ডাক্তার যেদিন প্রথম এসেছিল, সেই দিনের কথা আমি কোনদিন ভুলব না। ওরকম ঘটনা তো আর কোনদিন ঘটেনি। দেখেছি অনেক কিছু। মনে মনে বরাবরই রাগ হত। সাপের মত ফুঁসতাম। বলতে সাহস পেতাম না। মুখ ভার করে থাকতাম। মা কি ভেবে, পরে আমাকে খুব আদর করত। রোজ সন্ধ্যে হলেই যে মায়ের কাছে লোক আসত

তা না। যে রাত্রে মায়ের কাছে লোক আসত না, সেই রাত্রে আমি মায়ের কাছে থাকতাম। আমার বাবার খাটে শুতাম। তবে আমার ভাল লাগত না। কত লোক মায়ের কাছে সেই খাটে শুত। বাবা মারা যাবার পাঁচ মাসের মধ্যেই, পিসি মাকে রাজি করাতে পেরেছিল। বাবার মুখটা তখনো আমার এত মনে ছিল, কিছুতেই ভুলতে পারতাম না। সেইজন্যই নতুন নরম রঙ বেরঙের বিছানা পাতা সেই খাটে শুতে আমার ভাল লাগত না।

'এই তো, আমার ঘরের দেয়ালে বাবার ছবি টাঙানো রয়েছে। অনেক দিনের পুরনো বাবার একটা ছবি ছিল। হলদে হয়ে গিয়েছিল। টালির চালওয়ালা ঘরে ধোঁয়ায় আর ঝুলে ছবিটা একেবারে নষ্টই হয়ে যাচ্ছিল। মনে হয়, বাবা কোন সময় চৈতন্য দেবের মেলায় ফটোটা তুলেছিল। একলা, সঙ্গে কেউ নেই। আমার হঠাৎ কি খেয়াল হয়েছিল, বাবার একটা ছবি ঘরে রাখব। ছেলেবেলায় না, বড় হয়ে এ কথা আমার মনে হয়েছিল। কেন মনে হয়েছিল, তাও জানি না। এ লাইনে যখন পুরোপুরি চলে এলাম, পসার-টসারও বেশ ভাল হয়ে উঠল, তখন মনে হল, বাবার একটা ছবি থাকলে আমার যেন ইজ্জত বাড়ে। এ পাড়ায় আরো কয়েক জনকে দেখেছি, তারা বাবা মা, এমন কি বিয়ে হয়ে থাকলে স্বামীর ছবিও দেয়ালে টাঙিয়ে রাখে। তাতে মনে হয়, বেশ্যা হলেও তাদের সব ছিল। আমারও মনে হচ্ছিল, বাবার একটা ছবি টাঙিয়ে রাখব। তাই সেই পুরনো ঝুলপড়া ছবিটা নিয়ে এসে, একজনকে দিয়ে ছবিটা বড় করে আঁকিয়ে রেখেছি। আমার তো আর স্বামী নেই, থাকলে তার ছবিও রাখতাম।

'মনে আছে, দিনের বেলা মা এক রকম। আমাকে খুব আদর করত, ভালবাসত। রাত হলে মা আর আমার না। আমি সকালবেলা স্কুলে যেতাম। লেখাপড়ায় বেশ ভালই ছিলাম।

আমার থেকে বয়সে বড়দের থেকে অনেক আগে আগে যুক্তাক্ষর শিখে নিয়েছিলাম। নামতা, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ সব অঙ্কতেই প্রথম হতাম। আমি যখন ফোর ক্লাসে পড়ি, তখন সব ছেলেমেয়েরা আমার থেকে বড় ছিল। ননী মাস্টার আমাকে খুব ভালবাসত। সে জাতে বাগ্‌দি হলে কি হবে, মানুষটা খুব গুণের ছিল। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে ইস্কুলটা তৈরী করেছিল।

'বাবা বেঁচে থাকতে, ইস্কুলে যাবার সময়, যা কোনদিন পাইনি, মা তা-ই দিয়েছে। মা আমাকে অনেক পয়সা দিত। বাবা মারা গেল, মায়ের কাছে লোক আসতে লাগল, আমাদের অবস্থাও ভালো হতে লাগল। মা আমাকে আগে যত আদর করত, পরে তার চেয়ে বেশী করত। আমি একটু মুখ ভার করে থাকলে, মা আমাকে খুশী করার চেষ্টা করত। পয়সা দিত, খাবার দিত। ভাল ভাল জামা কিনে দিত। আমার একটু মুখ ভার করে, রাগ করে থাকার উপায় ছিল না।

'কিন্তু এখন তো বুঝতে পারি, পেয়ে পেয়ে আমার নোলা বেড়েছিল। আমি আরো বেশী রাগারাগি করতাম। সব সময়েই কি আর তা বলে মেয়েকে খুশী করা যায়। সবকিছুর একটা সীমা আছে। তখন মার খেতাম। আর মা একবার যদি রাগ করে, মার শুরু করত, একেবারে আধ মরা না করে ছাড়ত না। সেই যে বলে, গোসাপে কামড়ে ধরলে মেঘ না ডাকলে আর ছাড়ে না, সেই রকম। কেউ এসে ধরে ছাড়িয়ে না দিলে চুলের ঝুঁটি ধরে আছড়ে, হাতের কাছে যা পেত তাই দিয়ে পিটিয়ে আর কিছু রাখত না। অমন রাক্ষুসী পিসি সেও বলত, "ছ্যাখ বউ, এই মেয়ে মেরে তুই কোনদিন জেলে যাবি। এ তো খুন করবার মার।"

'মা বলত, "মরুক মরুক, এ হতচ্ছাড়া মরলে আমার হাড় জুড়োয়। জেলের ভাত খাব সেও ভাল। কোনকিছুতে মেয়ের মন পাওয়া

যায় না?" পরে রাগের মাথায় মা মুখ খারাপ করতেও শিখেছিল, "ভাতার খেয়ে এই যে খানকি বীত্তি করছি, সে কি একলার পেট ভরাব বলে? ছুঁড়ি ভেবেছে কী, অ্যাঁ। যখন তখন একটা না একটা কিছু চাই।"

'ও সব যাই হোক, মিছে বলতে পারব না, মা আমাকে ভালইবাসত। খাওয়া দাওয়া জামা কাপড়ে, কোন রকম শখ আহ্লাদ, কোন অভাব রাখেনি। আমিও মায়ের অনুগত ছিলাম। প্রথম প্রথম লোক আসা নিয়ে মায়ের ওপরে যে রাগ হত, সেটা কেমন যেন সয়ে গেল। একেবারে প্রথম দিকে কিছু বুঝতে পারতাম না। সন্ধ্যে রাত হলেই বাড়িতে কেন চুপিচুপি লোক আসে, মা কেন বাবার ঘরে দরজা বন্ধ করে দেয়, পিসি কেন আমার কাছ ছেড়ে নড়ে না, কিছু বুঝতে পারতাম না। আস্তে আস্তে বুঝতে পেরেছিলাম। তবে নিজের কাছে আর কি অস্বীকার করব, হতে পারে তখন আট বছর বয়স, সবই বুঝতে পারতাম। কুকুর বেড়ালের ব্যাপারও দেখেছি, মানুষের কাণ্ড কারখানা দেখেছি। ওই বয়সেই।

'কী ঘেন্নার কথা বাবা। নিজের কথাই বলছি। কিছু যে তেমন করে বুঝতে পারতাম তা না। কিন্তু হাঁ করে দেখতে দেখতে গায়ের মধ্যে কেমন করে উঠত। কেমন যেন বুক গুর গুর করে শিউরে শিউরে উঠত গায়ের মধ্যে। অথচ ভয় করত! কুকুর বেড়ালকে দেখে আবার ভয় করে নাকি! যদি একসঙ্গে কয়েকজন থাকতাম তা হলে ওরকম কিছু হত না। সবাই মিলে কুকুর বেড়ালকে ইঁট মারতাম। ছেলেগুলো ছিল আরো পাজী। তারা আবার কুকুরদের বাঁশ নিয়ে তাড়া করত। মারত। ছি ছি। এখন ভাবলেও খারাপ লাগে।

'তবে একলা একলা দেখলেই কেমন যেন লাগত। আজ শরীরের যে অঙ্গ আমার ভাত কাপড়, সেখানেই যত অনাচ্ছিষ্টি

ভাব। তারপরে কখনও মনে পড়ে আমাদের বাড়িটা পেরিয়ে গেলে, হাজরাদের পোড়ো ছিল। ভাঙা চোরা বাড়ি, জঙ্গল। ভিটের কাছাকাছি বিশেষ যেতাম না। ভয় ছিল ওখানে গোখরো সাপ আছে। সেই পোড়োর খোলা জায়গায় আমরা এককা দোককা কপাটি খেলতাম। এখন এই কলকাতার বেশ্যাপাড়ায় বসে সে কথা যেন ভাবা যায় না। হাজরাদের পোড়োয় কত খেলা খেলেছি। কত ফড়িং ধরেছি। প্রজাপতি ধরা মানা ছিল। প্রজাপতি ধরলে নাকি বিয়ে হয় না।

'পোড়াকপাল! হয়তো যে মেয়ে ছেলেবেলায় প্রজাপতি ধরেছে, তার চারটে বিয়ে হয়ে গিয়েছে। গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলেমেয়ে। ওসব কথার কোন দাম নেই। কথার কথা। সেই ছেলেমানুষ বয়সে ওসব কথা বুঝতে পারতাম না। হাজরাদের পোড়োটায় অনেক কাণ্ড হয়েছে। অকাজ কুকাজও কম হয়নি। কম হয়নি বলতে এমন না যে অনেক দিন অনেক কিছু করেছি। ভাবি, ভগবান কি সেই জন্যই আমাকে এমন অভিশাপ দিল। আমি কি সেই জন্যেই বেশ্যা হলাম। ভগবান সেই জন্যই কি সকলের কাছ থেকে আমার জামা কাপড় কেড়ে নিয়ে ল্যাংটো করে দিল! তাই যদি হবে কণার কেন তা হল না। কণার তো কত ভালো বিয়ে হয়েছে। ভাল ঘর ভাল বর, কিনা পেয়েছে। মায়ের কাছে শুনেছি। তিনটি ছেলেমেয়ে হয়েছে। স্বামী মস্ত বড় চাকরী করে। মনে হয় সুখেই আছে।

'সুখে আছে কিনা জানি না। বিয়ে করা কত বড় চাকুরে তো আমাদের কাছেও আসে! বুঝি তাদের অনেকের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে বিলেতে পড়তে গেছে। তবু আমাদের কাছে আসে। সেটা অবিশ্যি বৌয়ের বয়স হয়ে গেছে বলেই তো আসে। ব্যাটা-ছেলেদের তো খেয়াল থাকে না। তাদেরও বয়স হয়, বুড়ো হয়।

াকরী বাকরীতে বাইরে থাকে, পকেটে পয়সা কড়ি থাকে। সে যা
্শি করে। তবে এক তরফা ভেবে তো লাভ নেই। অনেক গেরস্থ
মেয়েছেলেও আছে, ঘরে তার দশ রকমের নাগর। ঘরে বাইরে বলে
কিছু না। যার যেমন রুচি আর ইচ্ছে। মন করে আমার খাজনা
াজনা, কে করবে আমার হরি ভজনা, সেই গোত্র। মন যাদের
খাজনা খাজনা করে, তারা খাজনার তালেই থাকে।

'তা সে যার যাই হোক, আমার এখনো কেমন যেন মনে হয়,
সে আমাকে কোনদিন ভাল চোখে দেখেনি। ভগবানের কথা
বলছি। সে কণাকে ক্ষমা করেছে। আমাকে ক্ষমা করেনি। কিন্তু
আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, তখন কি আমার বোঝবার ক্ষমতা ছিল।
কণার যদি কোন পুণ্যে তাকে ক্ষমা করে থাক, আমি অবুঝ ভেবে
আমাকেও ক্ষমা করতে পারতে। হাজরাদের পোড়োয় সেই যে
আসস্থাওড়ার জঙ্গলে জামা আর ইজের খুলে শুলাম, সেই থেকে
আমাকে আর জামা কাপড় পরতে দিলে না। মনে হয় যেন সেই
সময়, সেই দুপুরবেলাতেই তুমি যেন আমাকে শাপ দিলে, "এমনি
করে, এই করেই তোর সারা জীবনটা কাটুক।" আমার যেন তাই
মনে হয়। আর তো কখনো নিজের ইচ্ছেয় কিছুই করিনি। এখন
মাঝে মাঝে যাকে ইচ্ছে বলতে ইচ্ছে করে সে তো আমার ইচ্ছে না।
অনেকদিন খিদে মরে মরে হঠাৎ এক দিন একরকমের খাবার
দেখলে যেমন খেতে ইচ্ছে করে, এ সেইরকম। তার মধ্যে মন থাকে
না। যদি বা কোনদিন কখনো কারোর জন্য মনটা একটু নাচে, তবে
সেও পুতুল নাচের মত। এ জীবনে ধরে রাখার কিছুই নেই। ধরা
দেবার মত ধরা কেউ কখনো দেয় না।

'তখন সাত বছর সবে পার হয়েছি। তখন ইচ্ছে বা অনিচ্ছে,
তাও কিছু জানি না। একটা খেলার মত মনে হয়েছিল। ঈশ্বর,
তোমাকে বলা যা, আমার এ খাতায় লেখাও তা-ই। মেয়েমানুষটা

বসে আছি, তার সব কিছু সবাই দেখতে পায় না। তুমি দেখতে পাও। খেলা খেলবার দশ বার দিন আগে, হাজরাদের পোড়ো পেরিয়ে লক্ষ্মীদের বাড়ি যাচ্ছিলাম! লক্ষ্মীদের বাড়ি যাবার আগে, রাঙচিতের বেড়া ঘেরা বলাই কাকাদের বাড়ি পড়ত। বলাই কাকা যেমন ডাগড়া জোয়ান তেমনি গোঁয়ার ছিল। দেখলে ভয় লাগত। একটা কারখানায় সে কাজ করত। কতদিন দেখেছি, চোখ লাল করে বাড়ি ফিরেছে। শুনেছি মদ খেত। কাকীমাকে নাকি মারধোর করত।

'লক্ষ্মীদের বাড়ি যেতে গিয়ে দেখলাম, বলাই কাকার বাড়িটা নিঝুম চুপচাপ। এমনিতে ও বাড়িতে কোনদিন যেতাম না। রাঙচিতের বেড়ার মাথার ওপর দিয়ে দেখলাম, উঠোনের পেয়ারাতলায় একটা পাকা পেয়ারা পড়ে আছে। পেয়ারাটা দেখে কিছুতেই লোভ সামলাতে পারলাম না। বলাই কাকাদের বাড়ীর পেয়ারাগুলো খুব ভাল। কাশীর পেয়ারার মত সুন্দর আর মিষ্টি। বাড়ীটাও নিঝুম। মনে করেছিলাম, বাড়িতে সবাই বুঝি ঘুমোচ্ছে। ভেতরে যাবার দরজাটাও খোলা। কিছুই তো না। পা টিপে টিপে যাব, টুক করে পেয়ারাটা কুড়িয়ে নিয়ে দৌড় দেব। তারপরে লক্ষ্মীকে অর্দ্ধেক দেব, আমি খাব। তাছাড়া টের পাবেই বা কে। বলাই কাকাদের বাড়িতে কে-ই বা আছে। বাড়িতে কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। নতুন বিয়ে না হলেও, ছেলেমেয়ে হবার মত সময় হয়েছিল। বলাই কাকার মা সারাদিনই পাড়ায় পাড়ায় ঘুরত। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। পা টিপে টিপে গিয়ে পেয়ারাটা যেমনি তুলেছি, ঠিক পেত্নির হাসির মত একটা শব্দ শুনে চমকে গিয়েছিলাম। ভর দুপুরবেলা অমন হাসি শুনলে কার বুকের রক্ত না হিম হয়ে যায়। প্রথমে মনে হয়েছিল, শাকচুন্নিটা পেয়ারা গাছের ওপরেই বোধ হয় পা ঝুলিয়ে বসে আছে। নড়লে ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

পেয়ারাটা আসলে একটা ফাঁদ। বুকের মধ্যে দিয়ে কি যে করছিল। আমি রাম রাম করছিলাম।

'কিন্তু তারপরই গোঙানো মত একটা শব্দ শুনে আবার চমকে উঠেছিলাম। সোজা খাড়া হয়ে এদিক ওদিক তাকালাম। গাছের দিকে কিছুতেই তাকাই নি। দৌড় দেব ভাবছি, তখনই আবার সেই পেতনির মত হাসিটা শুনতে পেলাম। তখন মনে হল, ওটা ঠিক কোন পেতনির হাসি না, কোন মেয়েমানুষের হাসি, আর হাসিটা আসছিল বলাই কাকাদের ঘর থেকে।

'বলাই কাকাদের ঘর ছিল মাথায় টালি, মাটির দেওয়াল। সে দেওয়ালের মাটিও এক এক জায়গায় ধসে পড়েছে। বাঁশ বেরিয়ে পড়েছে। কারখানার কাজ করে যে মানুষ এত মদ খায়, তার মাটির দেওয়াল খসে খসে পড়বে না তো, কার পড়বে। কিন্তু হাসিটা কার! কাকীমার নিশ্চয়ই। কাকিমা কি পাগল নাকি যে, একলা ঘরে হাসছে। তার ওপরে আবার সেই মোটা গলার গোঙানো স্বর। ঠিক যেন একটা হুমদো কুকুরের মত। কেমন মনে হয়েছিল, ভাঙা দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি।

'চারপাশে একবার তাকিয়ে নিয়ে, পা টিপে টিপে একদিকের দেয়ালের কাছে গিয়ে উঁকি দিয়েছিলাম। অনেকখানি ফাঁক ছিল। মানুষের মাথা ছাড়ানো উঁচুতে দুটো ছোট ছোট জানালা ছিল। জানালা দুটো খোলা, ঘরে আলো পড়েছিল। কিন্তু হে ভগবান, উঁকি মেরে আমি যেন কেমন কাঠ হয়ে গেছলাম। আমার যেন একটুও নড়বার চড়বার ক্ষমতা ছিল না। দেখেছিলাম, বলাই কাকা আর কাকিমা, কারোর গায়ে এক চিলতে কাপড় বলতে কিছু নেই। ভেবে পাচ্ছিলাম না, দুজনে কি মারামারি করছে, নাকি হিন্দুস্থানিদের মত কুস্তি করছে। সেই অবস্থায় দুজনে শুচ্ছে বসছে হুড়োহুড়ি দাপাদাপি করছে। কাকিমা থেকে থেকে হেসে উঠছে আর বলাই কাকার

ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কাকিমা যদি হেসে না উঠত, তাহলে আমি ভাবতাম, বলাই কাকা নিশ্চই কাকিমাকে খুন করছে। যেভাবে জপটে ধরে চেপে ধরছিল, তাতে মানুষের মরে যাবার কথা। আর বলাই কাকাকে যে অবস্থায় দেখেছিলাম, ভগবান, আর আমার সে বিষয়ে তো কোন লজ্জাই রাখা হয়নি। কামুক উত্তেজিত ল্যাংটো পুরুষের শরীর দেখেই তো আমাদের সন্ধ্যে লাগে। গেরস্থের বাড়ীতে শাঁখ বাজে। যদি মন্দিরের ঠাকুরের কথা বলি, তবে তাও সেই ল্যাংটো পুরুষ দর্শন করেই আমাদের সন্ধ্যে হয়। কিন্তু জীবনে সেই দিন প্রথম একজন পুরুষকে সেই অবস্থায় দেখেছিলাম। তখন সবে সাত পেরিয়েছি। আমার মনে কোন পাপ ছিল না। শরীরে কোন সাড়া ছিল না। না, তাই বা বলি কেমন করে। শরীরে যে আমার কিছু হয় নি, তা বলব কেমন করে। সেই জন্যই তো ভগবানকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, সে কি কেবল আমার, এই একটি মেয়ের, যার শরীরেই অনেক পাপ ছিল। নাকি সকল মেয়ে জাতের মধ্যেই এমনটি আছে। কতক্ষণ আমি ওরকম দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম, এমন আর মনে করতে পারি না। বলাই কাকা আর কাকীমাকে ঠিক কুকুর বেড়ালের মত দেখাচ্ছিল।

'তবে কুকুর বেড়াল দেখে যেমন শরীরের মধ্যে কেমন একটা ভাব হত, তাদের দেখে সেইরকমই হয়েছিল। কিন্তু তার থেকে যেন বেশী কিছু। যতটা ভয়, ঠিক ততটাই শিউরোনি। আমার শরীরের মধ্যে যেন কী হচ্ছিল। মেয়ে আর পুরুষ ওই সব করে। তার একটা এরকম ধারণা ছিল। ধারণাটা কিছুই নয়। সমস্ত ব্যাপারটা যেন আরো ভীষণ অন্যরকম। কিছুক্ষণ পরেই আমার যেন গোটা শরীরে একটা ধাক্কা লাগল, আমি উঠোনের দিকে তাকালাম। কেউ না, কিছুই না। উঠোন, রোদ, গাছপালার দিকে তাকিয়েই আমি যেন শরীরে বল পেয়েছিলাম। একছুটে লক্ষ্মীদের বাড়ী চলে

গেছলাম। তারপরে দেখেছিলাম, হাতের পেয়ারাটা বাহুড়ে খাওয়া। ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম।

'এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, বাহুড়ে খাওয়া পেয়ায়াটা দিয়ে কি ভগবান আমাকে ঠাট্টা করেছিল। এখন সমস্ত ঘটনাটা মনে হলে, মনে হয়, কী যেন একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছিল। ভেবেছিলাম, লক্ষ্মীকে ঘটনাটা বলব। বলতে পারিনি। পরের দিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে আমার মনেও ছিল না। ইস্কুলে চলে গেছলাম। ইস্কুলে একবার কথাটা হঠাৎ মনে হয়েছিল। তারপরেও সারাদিনে কয়েকবার মনে পড়েছিল।

'কথাটা আমার মায়ের জন্য না। তবে, বলাই কাকা আর কাকীমার ব্যাপারটা মনে পড়ত মায়ের কাছে লোক এলে, যখন বাবার ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যেত। কী যে খারাপ লাগত। যাই হোক, আমার কথাই বলি। আমরা তো শুধু মেয়েরাই খেলা করতাম না, ছেলেরাও আমাদের সঙ্গে খেলত। সবাই আমরা সমবয়সী। আমাদের কারোরই নিজেদের মধ্যে তেমন লজ্জা ছিল না। তবে মেয়েদের লজ্জা একটু হয়ই। ছেলেরা যেমন পেচ্ছাব পেলেই, আমাদের সামনেই ইজের ফাঁক করে সেরে নিত, আমরা সাত আট বছরের মেয়েরা তা কখনো পারতাম না। আমরা একটু আড়ালে আড়ালে গিয়ে কাজ সেরে আসতাম।

'বেন্দা। ছেলেটার নাম বৃন্দাবন ছিল, গোঁসাই বাড়ির ছেলে। আমরা একসঙ্গে পড়তাম। আমরা বেন্দা বেন্দা বলেই ডাকতাম। বলাই কাকাদের ব্যাপারটা দেখার পরে, এক রবিবারে হাজরাদের পোড়ো পেরিয়ে লক্ষ্মীদের বাড়ী যাচ্ছিলাম। তখন দেখেছিলাম, বেন্দা পোড়োয় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে ফিরে পেচ্ছাব করছে। আমাকে দেখে ওর লজ্জা করল না। আমারো কোনরকম লজ্জা করার কথা না। কিন্তু বেন্দা যেন কী! ভেবেছিলাম, ওকে অমন দেখাচ্ছে কেন,

ঠিক যেন বলাই কাকার মত। অন্য ছেলেদের তো ওরকম থাকে না। সকলেই কেমন শান্ত আর ঠাণ্ডা। তাই যেন আমার কেমন একটু লজ্জা করে উঠছিল। আসলে ওটাকে খারাপ লাগাই বলা চলে: আমি চলেই যাচ্ছিলাম। বেন্দা হঠাৎ আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিল, "কোথায় যাচ্ছিস রে নুড়ি?"

'আমি বলেছিলাম, "লক্ষ্মীদের বাড়ি।"

'দেখেছিলাম, ওর প্যাণ্টের কোমরের কাছে বোতামের সঙ্গে একটা সুতোয় তিন চারটে ফড়িং বাঁধা। ফড়িংগুলো ফর্ ফর্ করছে। বুঝতেই পারছিলাম, রবিবারের সারা দুপুরটা হাজরাদের পোড়োয় বেন্দা কী করেছে। আমার লোভ হয়েছিল, চেয়েছিলাম, "একটা ফড়িং দিবি?"

'বেন্দা কোন জবাব না দিয়ে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছিল। তারপরে হঠাৎ বলেছিল, "জানিস নুড়ি, আজ একটা মস্ত দাঁড়াশ্ সাপ দেখেছি। ঝুপ করে আমার পায়ের কাছে পড়েই এক দৌড়।".

'আমি চমকিয়ে উঠে বলেছিলাম, "কামড়ে দিতে আসেনি?"

'বেন্দা হেসে উঠে বলেছিল, "দাঁড়াশ্ সাপ বুঝি কামড়ায়! লোক দেখলেই দৌড়ে পালায়।"

'সেরকম কথা আমারও শোনা ছিল বটে। তবু সাপ তো। সব সাপকেই আমার ভয় করত। ছেলেবেলায় করত,, এখনো করে। রাস্তায়, বাড়ির উঠোনে হেলে, ঢোরা তো অনেক সময়েই চলে ফিরে বেড়াতে দেখা যেত। কেউ গা করত না ভয় পাওয়া দূরের কথা। আমি ভীষণ ভয় পেতাম। সাপ দেখলেই আমার গায়ের মধ্যে যেন কিছু কিলবিলিয়ে উঠত। তবে দাঁড়াশ্ সাপের কথা শুনলেও, আমি বেন্দার কোমরের সঙ্গে সুতোয় বাঁধা ফড়িং-গুলোকেই দেখছিলাম। বেন্দাটার আঙুলে যেন আঠা লাগানো। হাত বাড়ালেই ফড়িং ধরতে পারত। আমি পা বাড়াবার আগেই,

বেন্দা আবার পোড়োর ভেতর দিকে চলতে আরম্ভ করেছিল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আবার কোথায় যাচ্ছিস রে ?"

'বেন্দা বলেছিল, "যাই ফড়িং ধরি গিয়ে।"

'কথাটা শুনে আমার লোভ হয়েছিল। ভেবেছিলাম, লক্ষ্মীদের বাড়ি না হয় বিকেলে চুল টুল বেঁধে যাব। এখন গিয়ে কয়েকটা ফড়িং ধরি। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলে, বেন্দা এক আধটা নিজেই ধরে দিতে পারে। আমিও ওর সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিলাম। আজ আর সব কথা মনে নেই, আমরা দু'জনেই অনেক কথা বক বক করেছিলাম। ইস্কুলের কথা, অন্য ছেলেমেয়েদের কথা। নেহাৎ দুপুরবেলা বলেই, আমাদের সঙ্গে অন্য ছেলেমেয়েরা ছিল না। সকালে বিকেলে হাজরাদের পোড়োয় আর জঙ্গলে ছেলেদের মেলা লেগে যেত।

'বেন্দা ক্রমেই ঘন জঙ্গলের দিকে চলে যাচ্ছিল। একলা একলা ভর দুপুরে আমি কখনো হাজরাবাড়ির পেছনের জঙ্গলে যেতাম না। সবাই বলত, ওদিকটায় সাপ আছে। বেন্দা তো ছেলে। ছেলেদের সাহস বেশি আগে তা-ই মনে হত। এখন বুঝতে পারি, কথাটা ভুল। ছেলেদের সাহস বেশি না। গায়ের জোরের একটা ভরসা তাদের আছে। আসলে তাদের জ্ঞান কম। কী বিপদ আপদ ঘটতে পারে, সে ধারণা ওদের নেই। ছোট মেয়েরা অল্প বয়সেই যত সাবধান হতে পারে, ছেলেরা তা পারে না। পারলে বড়রা যেখানে ভয়েও যেত না, ছেলেমানুষ বেন্দা কখনো যেতে পারত ?

'বেন্দার সঙ্গে গেছলাম বলে, প্রথম ফড়িংটা ধরে ও আমাকেই দিয়েছিল। তারপরে যেটা ধরেছিল, সেটা আর আমাকে দেয়নি। চেয়েছিলাম বলে এমন বিচ্ছিরি ভঙ্গি করেছিল। পাজী ছেলেরা যা যা করে। কোমরটা সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে যেন কিছু দেখাচ্ছে, এমনি ভঙ্গিতে অসভ্যের মত করেছিল। এখন মাঝে মাঝে ভাবি, পুরুষের কি ওটা একটা বড় অহংকার নাকি। মেয়েদের ওপরে

তাদের যত জোর জবরদস্তি খাটাবার জন্য। একটা অঙ্গের হেরফের কি তাদের মনে খুব গুমোর তৈরী করে ফেলে।

'ছেলেবেলায় খুব অবাক হয়ে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ছেলেদের নাভির নিচের দিকে। তারপর নিজের নাভির নিচের দিকে। আমার নিজের কোন ভাই ছিল না। সেটা একটা মনের কষ্ট ছিল? মাকে ছেলেবেলায় কত বলেছি, "আমার একটা ভাই কেন হয় না।" মা সব সময়েই জবাব দিত, "ভগবান না দিলে কী করে হবে।" ছেলেবেলায় জানতাম, ভগবান না দিলে ভাই হয় না।

'আজও কি তার চেয়ে বেশি জানি। ছেলেবেলায় যা জানতাম, এখনো তাই জানি। ভগবান না দিলে কিছুই হয় না। আজ তো আমারও একটি পাঁচ বছরের ছেলে থাকতো পারত। বছরখানেক সে বেঁচেও ছিল। তারপর মারা গিয়েছিল। অসুখ বিসুখ তো অনেক ছেলেমেয়েরই হয়। সবাই তো মারা যায় না। আমার ছেলেটি মরে গেল কেন! ভগবান না রাখলে কিছু থাকে না। সকলে হয়তো একথা মানে না। দেখি তো কত লোকে কত রকমের বলে। আমাদের এ লাইনেই কত মেয়ে ভগবানের নামে মুখ ঘোরায়। আমি বিশ্বাস করি না যে, তারা ভগবানকে ভাবে না, ডাকে না। ডাক আর কতটুকুইবা কে ডাকি। আমার তো ছাই তাকে ডাকবার কথা মনে থাকে না। কিন্তু সময় হলেই মনে পড়ে। রোজ রোজ তো কই, সন্ধ্যে হলেই একজন শাঁসালো খদ্দের দরজায় এসে কোঁচা ঝাড়ে না, অথবা তেমন মনের মত একজন নাগর। সবই ভাগ্য। ভগবান না দিলে হয় না।

'যে কথা বলছিলাম। খুব ছেলেবেলায়, ছেলেদের নাভির নিচের দিকে তাকিয়ে, নিজের দিকে তাকিয়ে বড় মন খারাপ হত। মরণ, মানুষের মন যেন কী আজব কলের যন্ত্র। ভাবতাম, ছেলেদের কেমন একটি জিনিস আছে। আমার নেই। ওদের

কেমন হাত দেবার, ঘাঁটবার একটা জিনিস আছে। যার কিছু আছে, তাকেই তো লোকে চেয়ে দেখে। ছেলেবেলায় তেমনি তাকিয়ে দেখতাম। মনে মনে অবাক হতাম, দুঃখও লাগত। এখন বুঝতে পারি সেটা। হুস্ করে আমার একটি নিশ্বাস পড়ত মনে মনে। ছোট ছেলেদের আদর করবার সময় হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতাম। মনে মনে ইচ্ছে হত ছুঁতে।

'তা বলে কি আর সেই সাত বছর বয়সে ওসব আর মনে হত। সাত বছরের ছেলের লজ্জা না থাকতে পারে, সাত বছরের মেয়ের লজ্জা তাদের থেকে বেশি। তারা নিজেদের প্যাণ্টের বোতাম যেখানে খুশি খুলতে পারে, মেয়েরা পারে না। গরীবই হোক আর বড়লোকই হোক, দেখেছি, মেয়েদের ছেলেমানুষ বয়স থেকেই সহবত শেখানো হয়। ছেলেরা সেরকম বয়সে যাই করুক, তাদের সাত খুন মাপ। মেয়েদের না।

'বেন্দা এরকম ভঙ্গি করায় আমার খুব রাগ হয়েছিল। বলেছিলাম, "একটা ফড়িং চাইছি বলে ওরকম করছিস কেন ? তুই ভারি অসভ্য।"

'বেন্দার ওসব থোড়াই কেয়ার। ও আমার কথার জবাব না দিয়ে আবার ফড়িংয়ের পেছনে ঘুরছিল। আমি সেই একটি ফড়িং নিয়েই বেন্দার ফড়িং ধরা দেখছিলাম। রাগ করেও যে চলে যাবে, তা পারছিলাম না। বেন্দা ফড়িংয়ের পেছনে পেছনে অনেকখানি দূরে চলে গেছল। চারদিকে আসস্যাওড়ার ঝোপঝাড়ে ঢাকা জঙ্গলের মধ্যে আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। চলে যাব কী না, ভাবছিলাম। একটু পরেই বেন্দা ফিরে এসেছিল। আর একটা নতুন ফড়িং তখন ওর হাতে। সেটাকে সুতোয় বাঁধতে বাঁধতে বলেছিল, "তোরটা দে নুড়ি, সুতোয় বেঁধে দিই। তারপরে আবার খুলে দিয়ে দেব।"

'আমি দিয়েছিলাম। মনে মনে আশা, বেন্দাকে খুশি করতে

পারলে পরে একটার বেশি ফড়িং জুটতে পারে। বেন্দা পাঁচটা ফড়িং সুতোয় বেঁধে, আসস্যাওড়ার ডালের সঙ্গে সুতোটা বেঁধে দিয়েছিল। ফড়িংগুলো উড়ছিল, দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল। কত ভাল যে লাগছিল আজ এই বয়সে তা কেমন করে বোঝাব। বেন্দা হাততালি দিয়ে উঠেছিল, "আরে বাস রে, কী রকম উঁচু দিকে উঠেছে দ্যাখ?"

'আমিও বেন্দার সঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠেছিলাম। বেন্দা হাততালি দিয়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে গান করছিল। আমি লাফিয়ে লাফিয়ে হাততালি দিয়ে, ফড়িংগুলোর ওড়া দেখছিলাম। তারপর দু'জনেই বসে পড়েছিলাম। দু'জনে যে কী বক বক করেছিলাম তা আর এখন মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে, বেন্দা বলেছিল, একদিন ও একশোটা ফড়িং ধরে সুতোয় বেঁধে ওড়াবে। শুনে আমি হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম।

'তারপরেই জানি না, কোথা থেকে কি ঘটে গেছল। দেখেছিলাম, বেন্দা নাভির নিচে ঘাটছে। বোতাম খোলা, সবই দেখা যাচ্ছে। রক্তবর্ণ একটা শক্ত ছোট সরু শোলার খেলনার মত। ও কিন্তু আমার দিকে দেখছিল না। আপন মনেই ওরকম করছিল আর ফড়িংগুলোর ওড়া দেখছিল। হঠাৎ আমার দিকে কিছু বলার জন্য ফিরে তাকিয়েছিল। আমি ওর নিচের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে, ও নিজেও সেদিকে দেখেছিল। হেসে আমার দিকে তাকিয়েছিল। বলেছিল, "তোরটা দেখি।"

'আমি যে কি বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। লজ্জা করছিল খুব। দৌড়ে পালিয়ে যাব কিনা ভাবছিলাম। কিন্তু পালাতেও পারছিলাম না। খালি বলেছিলাম, "যা"।

'বেন্দা প্যান্টের অনেকটা খুলেই ও জিনিসটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। তখন ও ফড়িংয়ের দিকে দেখছিল না। আমার দিকে ফিরে বলেছিল, "খেলবি?"

'আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, "কি খেলব ?"

'বেন্দা ঘাড় নেড়ে বলেছিল, "আমি একটা খেলা জানি।"

'তখনো আমি পালাবার কথা ভাবছিলাম! পালাতে পারিনি। আমার ঝুঁটি ধরে যেন কে সেখানে বসিয়ে রেখেছিল। এক চুল নড়তে পারিনি। কেবল থেকে থেকে টুনটুনি পাখীর ল্যাজ নাচানোর মত, বেন্দার সেই জিনিসকে যেন নাচতে দেখছিলাম। স্পষ্টই মনে আছে. আমার শরীরের মধ্যে যেন কেমন করছিল। ভয়ও করছিল। ওট যে একটা খারাপ ব্যাপার তাও মনে হচ্ছিল। আবার জিজ্ঞেস করেছিল "খেলবি না ?"

'আমি বলেছিলাম, "না, আমার ভয় লাগছে।"

'আমার তখন বলাই কাকার শরীরটার কথা মনে পড়েছিল। সে আর কাকীমা যা করেছিল, সেই ঘটনাটা সব দেখতে পাচ্ছিলাম। বেন্দা বলেছিল, "এখানে কেউ আসবে না। ইজেরটা খোল।"

'কেউ আসবার ভয়ের কথা আমি বলেছিলাম কিনা, মনে পড়ে না, আমি অন্য ভয়ের কথাই যেন ভাবছিলাম। মেয়ে তো। শরীরটা আমার অনেকখানি বস্তু। কিন্তু আমি বেন্দাকে অগ্রাহ্য করতে পারিনি। উঠে দাঁড়িয়ে আমার ইজেরটা খুলেছিলাম। বেন্দা বলেছিল, "শুয়ে পড়।"

'আমি শুয়ে পড়েছিলাম। বেন্দা প্যান্টটা একেবারে খুলে ফেলেছিল। আমার গায়ের উপর রোদ আর ছায়া। মাথার উপরে আকাশ। বেন্দা আমার বুকের উপর এসে শুয়েছিল। আমার কী হয়েছিল আমি জানি না। বেন্দারই বা কী হয়েছিল জানি না। আমি যেমন শুয়েছিলাম, তেমনি শুয়েছিলাম। একটা কী করছিল বেন্দা। বলাই কাকার মত। আমি মনে করছিলাম, আমি আর বেন্দা, কাকীমা আর বলাই কাকার মত করছি। কিন্তু কাকীমার মত

হুড়যুদ্ধ হাসাহাসি করিনি। আমার কোন কষ্ট হয়নি। বেন্দা আর আমি কেবল খেলেছিলাম।

'আমি যেন চোখের সামনে এখনো স্পষ্টই সেই ঘটনা দেখতে পাচ্ছি। এখন আমার সব কিছুতেই পাপ। মিছে কি বলব যে বস্তুতে আর কোন টান নেই, তাতে যেন এখন আমি বেন্দাকে টের পাচ্ছি। সাত বছর বয়সে যা বুঝতে পারিনি, এখন সাতাশ বছরের বুড়ি বেশ্যার শরীরে সেই খেলা যেন নতুন করে খেলে উঠেছে। কিন্তু জেনে শুনে কোন পাপ করিনি। হাজরাদের জঙ্গলে গোঁসাইদের বেন্দার সামনে সেই যে ল্যাংটো হলাম, সেই যে খেললাম, সেই খেলাই তুমি অক্ষয় করে রাখলে। সেই খেলাতে ভাত কাপড় দিলে। টাকা পয়সাও দিলে। আর বড় ঘেন্না দিলে।

'কাল থেকে ঋতু হয়েছে, শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। এখন তু' তিনদিন লোক বসানো যাবে না, তাই বসে বসে লিখছি। ঘরে দরজা বন্ধ করে একটানা লিখছি।

'এ কথা কেন মনে হয়? মনে হয়, সেই আমার শুরু। সেই শুরু বলব না। তবে শরীর নিয়ে, সেই আমার প্রথম খেলা। তারপরে আর কোনদিন বেন্দার সঙ্গে সে খেলা খেলিনি। কিন্তু আমার সামনে বেন্দা খেলেছিল। সেই হাজরাদের পোড়োর জঙ্গলে, কণার সঙ্গে। কণা এখন অতি বড় ঘরণী। মেয়েমানুষ বলে না, কণা তো আমার থেকে সুন্দর ছিল না।

'কিন্তু এখন ভাবি, কেন অমন খেলা খেলতে গেছলাম। আমার মায়ের পাপে কী? মায়ের কোন কথা তো আমার মনে পড়েনি। আমার বাবা যে বড় ভাল লোক ছিল। তাকে সবাই নিরীহ সজ্জন বলত। বাবা আমাকে জন্ম দিয়েছিল। যদি বলি রক্তের দোষ, তাই-বা কেমন করে হয়। আর সে তো আমি একলা খেলিনি।

কথা বলে না, গল্প গুজবে জানতে পারতাম, খেলাটা অনেক ছেলেমেয়েই খেলত।

'তবে হ্যাঁ, সকলে তো নুড়ি না! আমার কপাল সকলের হবে। কিন্তু সকলের মত কপাল আমিও চেয়েছি। পাড়ার কোন মেয়ের বিয়ে হলে, বর এলে, ছুটে ছুটে দেখতে গেছি। বর দেখতে খুব ভাল লাগত। তা সে যেমনই হোক। নেহাত কালো কুচকুচে নাক খ্যাঁদা মাথায় টাক পড়া না হলেই হল। ছেলেবেলায় বরের বেশে যাকে দেখতাম, তাকেই ভাল লাগত। যে কনেকে দেখতাম, তাকেই ভাল লাগত। বর তো, একথা কি আর নিজেকে বলবার দরকার আছে, মনে মনে কনে হবার কত শখ ছিল। কেঁদে কেটে, সবাইকে কাঁদিয়ে বরের সঙ্গে চলে যাব। বারো বছর বয়স অবধি তাই বুঝতাম। তেরোর পরে আর জানিনি। তেরোতেই সব শেষ। তেরো বছর পড়তে, সব আশা শেষ!

'আজ বাড়ীওয়ালী ফুলবাসিয়ার ঘরে কোথা থেকে একটা ছোট মেয়েকে এনেছে। নতুন বলির পাঁঠা। বারো তেরো বয়স হবে। এখন কত খেলাই হবে মেয়েটিকে নিয়ে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হবে, মেয়েটির প্রথম পুরুষ!

'আমার বেলায় তা হয়নি। বাড়ীওয়ালীর ঘরে মেয়েটিকে দেখে, সেই চৌদ্দ বছর আগের দিনটার কথা মনে পড়ে গেল। বাড়ীওয়ালীর ঘরে মেয়েটাকে দেখেছি। একবার মায়া লাগছে। আবার মনে হচ্ছে, বেশ হচ্ছে। আমারও তো একদিন হয়েছিল।

'তবে পিসির জ্বালাতনের কথা আমি ভুলব না। মায়ের কাছে লোক আসা শুরু থেকে, পিসি বরাবরই আমার কাছে শুত। দু'একটা বছর, পিসি ভাজা মদ খেয়ে, বক বক করে ভালই ছিল। তারপরে পিসির কি রোগ হয়েছিল, সে আমাকে জাপটে নিয়ে শুত। আমার কি লজ্জা! বুড়ী মাগীর গায়ের ঘেষটানি আমার একেবারে বরদাস্ত

হত না। কিন্তু বুড়িটির মতলব ছিল আলাদা। তখন আমার দশ এগারো বছর বয়স। ক্লাস ফোর ছেড়ে ফাইভে উঠেছি। কেন যে মাষ্টার আমাকে বৃত্তি পরীক্ষায় যেতে দেয়নি, জানি না। বরাবর জানতাম, আমাকে বৃত্তি পরীক্ষায় পাঠানো হবে।

'পিসি খলখল করে হাসত। আমাকে টেনে নিয়ে বলত, "আয় আমি তুই বর বউ হই।"

'আমি বলতাম, "মরণ। তোমার বুঝি ভীমরতি হয়েছে পিসি।"

'পিসি সেই বয়স থেকে আমার গায়ে হাত দিত। হাত দিতে আমার আপত্তি কি। বুড়ি মেয়েমানুষ গায়ে হাত দেবে, তাতে কি যায় আসে। কিন্তু বুড়ি ছিল হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। খারাপ খারাপ কথা বলত, ভঙ্গি করত। আর গায়ে বুকে বা এমন সব জায়গায় হাত দিয়ে এমন সব করত, খারাপ লাগত, গাটা যেন কাঁটা দিয়ে উঠত। আমি হাত পা ছুঁড়ে, দাপিয়ে একটা কাণ্ড শুরু করতাম। আবার কোন কোন সময় আমার যেন ফিট রোগের মতন হত। পিসিকেও থামাতে পারতাম না, আমার হাত পা পাকিয়ে উঠত, কী করতাম নিজেই জানতাম না। শরীরের মত কেঁপে শিউরে একটা সুখের মতন লাগত। তারপরে মড়ার মত পড়ে থাকতাম। কতদিন এমন হয়েছে, হাত কামড়ে দিয়েছি।

'মায়েরও ওসব ভাল লাগত না। কতদিন বলেছে, "নন্দ ঠাকুরঝি, তুমি মেয়েটাকে নিয়ে পড়েছ কেন? ছেলেমানুষকে ওরকম করো না। আমার তো ইহকাল পরকাল, তুই-ই গেছে।"

'মা আগে আগে তা-ই বিশ্বাস করত। মা আমার বিষয়ে আগে অন্যরকম ভাবত। পিসিই মায়ের কানে মন্ত্র দিতে আরম্ভ করেছিল। আমি যতই বড় হয়ে উঠছিলাম, ততই পিসির মন্ত্র বাড়ছিল। এমনও অনেক দিন দেখেছি, আমি অন্য দিকে তাকিয়ে আছি, পিসি আমাকে দেখিয়ে মাকে যেন চুপিচুপি কী বলছে। আমার চোখ পড়ে গেলেই

থমকে যেত। আমি পরে মাকে জিজ্ঞেস করলে, মা বলত, "ও নন্দ ঠাকুরঝি পাগল, ওর কথা শুনতে নেই।" সত্যি যদি সেই ডাইনী কুটনি বুড়ির কথা বলেই মা মনে করত, তা হলে আমার জীবনে আজ কী হত কে জানে। টের পাচ্ছিলাম, আমি আস্তে আস্তে বড় হচ্ছি। আমার বুক বড় হচ্ছিল। বাবার শরীরের আড়াটা পেয়েছিলাম। মোটামুটি লম্বা হওয়ার দিকে ঝোঁক ছিল। বারো বছর বয়সেও আমি ফ্রক পরতাম। তখন ক্লাস সিক্সে উঠেছি। আমাকে দেখে পাড়ার সবাই বলত, "দশাসই মাগী হয়ে উঠেছে।"

'আমার দিকে রাস্তার পুরুষেরা যেভাবে তাকাত তাতেই বুঝতে পারতাম, আমি বড় হচ্ছি, বড় হতে চলেছি। সকলেই, সব পুরুষেরাই আমার বুকের দিকে তাকাত। তারপরেই আমার কোমরের দিকে। ভাবতাম, এমন তো একেবারে সত্যি দশাসই হয়ে উঠিনি। গায়ে গাদা গুচ্ছের মাংসও লাগেনি। আমার থেকে অনেক বেঁটে মেয়ের বুক দেখে মনে হত, কুড়ি বাইশ বছরের মেয়ের বুক। আমার তো সেরকম কিছু ছিল না। বরং একটু লম্বা ভাবের ছিলাম বলে, শরীরের ধাঁচ একটু রোগা রোগাই ছিল। তবে পুরুষের চোখই বোধ হয় ওরকম! মেয়েরা একটু বড় হলে, সকলের দিকে তারা এক রকম চোখেই তাকায়।

'আমি তো আর আগের ইস্কুলে পড়তাম না। অন্য ইস্কুলে। তবে সেখানে পাকিস্থানের ছেলে-মেয়েরা পড়ত। ইস্কুলটা খুব পুরনো ছিল না। সেখানে দিদিমণিরা পড়াত। মাষ্টারমশাইরাও পড়াত। দু'জন মাস্টারমশাই ছিল। দুজনেই আমার বুকের দিকে, কোমরের দিকে তাকিয়ে দেখত। যেমন বাইরের আর অপর লোকেরা দেখত। তবে বাইরের রাস্তার লোকেরা দেখত বেহায়ার মত। মাস্টার-মশাইরা সেভাবে না।

'তখন ইস্কুলে মেয়েদের নিয়ে কত ঘটনাই ঘটত। আমাদের

সঙ্গে পড়ে এমন মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করত। আবার চিঠিও লিখত। আবার সে সব চিঠি ধরা পড়লে, কত কাণ্ড হত। আমার সে-সব কোন দিন হয়নি। কোন ছেলের সঙ্গে আমার প্রেম হয়নি। কোন ছেলেকে জীবনে একটা চিঠিও লিখিনি। আমার কত বন্ধুই বলত, তাদের প্রেমের গল্প। আমি কেবল হাঁ করে শুনেছি। কেন, বুঝতে পারি না, আমার বেশ মনে আছে, মনে হত আমার ওসব হবে না। বিশেষ কোন গুণটুন না থাকলে ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করা যায় না।

'এখনো মনে আছে, আমাদের পাড়ায় শ্রীনাথের মুদি দোকানের সঙ্গে মনিহারি জিনিসপত্রও ছিল তার দোকানে প্রায়ই যেতাম। শ্রীনাথ আমাকে সেধে লজেন্স টফি দিতে চাইলেও নিতাম না। লোকটাকে আমার মোটেই ভাল লাগত না। কণা বলেছিল, "শ্রীনাথ দোকানীটা খুব খচ্চর আছে ভাই। আমার বুকে একদিন খাবলে দিয়েছিল।" আমাদের বয়সী আরও কয়েকটা মেয়ের কাছ থেকে শ্রীনাথ দোকানীর বিষয়ে এরকম শুনেছি। লোকটা যেন চোখ খাবলা ছিল। এমন তাকিয়ে থাকত যে, চোখের পলক পড়ত না। যেন মেয়েদের বুক কোনদিন দেখেনি, এমন আদেখলের মতন তাকিয়ে থাকত। তার তাকিয়ে থাকা দেখলে মনে হত, কম্বল মুড়ি দিয়ে থাকি। লোকটার লাজ লজ্জা বলে কিছু ছিল না। মনে মনে এমন রাগ হত! হেসে হেসে আবার কথা বলত। রোগা টিঙটিঙ, হাত পাগুলো লিকলিকে, পেটটা মোটা। মাথায় চুলের খুব বাহার ছিল। তেল জল দিয়ে বেশ পেটো করে আঁচড়াত।

'অল্প বয়সের মেয়েদের দেখলে ওরকম করত। অথচ বিয়ে করেছিল, একপাল ছেলেমেয়েও ছিল। একদিন আমি লোকটার ফাঁকে পড়ে গেছলাম। সময়টাও সেই রকম। এই দেখ আকাশ শুকনো। একটু পরেই উপরঝস্তি বৃষ্টি। সেইরকম বৃষ্টির মধ্যে, শ্রীনাথ তার

দোকানে একদিন আমাকে একলা পেয়েছিল। পালাব কি পালাব না ভাবছিলাম। শ্রীনাথ তখনও তার আলমারির সামনে উঁচু টুলের ওপর বসেছিল। আমাকে বলেছিল, "বৃষ্টির মধ্যে বাইরে কেন রে, ভেতরে আয়।"

'আমি তার চোখের দিকে দেখেছিলাম। কেমন যেন বিশ্বাস হয়েছিল। যে দিকটায় মুদিখানার মালপত্র থাকত সে দিকটায় চলে গেছলাম। তারপরেই সাপের কুণ্ডলী খুলে গেছল। আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। এসে কোন কথা না, সোজা বুকে হাত, আমি ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলাম। শ্রীনাথ দাঁত বের করে হেসেছিল, "ওরকম করছিস কেন রে নুড়ি। শোন না।', বলে এমন জোরে বুকে খাবলে ধরেছিল, আমার লেগেছিল। আমি তার বুকের ওপর একটা চড় কষিয়ে দিয়েছিলাম। তাতে কি ও কুত্তাটার লাগে। চড় খেয়ে হেসেছিল। বলেছিলাম, "ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। পেনসিল দেবে তো দাও, তা না হলে চলে যাচ্ছি।"

'ওমা, মড়াটা তখন হেসে বলেছিল, "আহা, পেনসিল কেন, যা চাইবি তাই দেব, লজেন দেব টফি দেব, চানাচুর ভাজা দেব। চুলের ফিতে চাস, রিবন চাস, তাও দেব। একটু কাছে আয় না। এখন তো কেউ নেই।"

'বুঝেছিলাম শ্রীনাথকে বলে কিছু হবে না। সে আমার কোন কথা শুনবে না। এরকম বৃষ্টিতে আমাকে একলা পেয়েছে। কিছুতেই ছাড়বে না। তবে আমার যেন শ্রীনাথকে তেমন ভয় করছিল না। সেই যে একটা বুক গুরগুরনো ভয়, না জানি কী হবে, সেরকম কিছু মনে হয়নি। আমি একবার দরজটার দিকে দেখেছিলাম। তার পরেই ছুট দিয়েছিলাম। কিন্তু যাই হোক, তখন শ্রীনাথের থেকে আমি চালাক ছিলাম না! সে বুঝতে পেরেছিল, আমি দৌড় দেব। সে তৈর হয়েই ছিল। আমাকে দু হাতে জাপটে

ধরেছিল। ধরেই, আমাকে নিয়েই বসে পড়েছিল। মেঝেতে বসে পড়লে রাস্তা থেকে কিছুই দেখা যায় না। মেঝেতে ফেলেই, আমার ফ্রক তুলে, ইজের ধরে টান দিয়েছিল। আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, "তবে রে মড়া, শোরের বাচ্চা। নিজের মেয়েকে গিয়ে এসব কর না।"

'বলে আমি ওর চুলের মুঠি ধরে, বুকের জামা টেনে, পা ছুঁড়ে ওঠবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু মড়াটার পেট মোটা লিকলিকে হাতে পায়ে যে এত জোর ছিল, তা কে জানত। আমার মারধোর গ্রাহ্য না করে সে আমার ওপরে চেপে পড়েছিল। আমি হাত পা ছুঁড়ছিলাম সমানে। গালাগাল দিতে কিছু বাকী রাখিনি। তারপর হঠাৎ লোকটা আমার শরীরের ওপরে একেবারে নেতিয়ে পড়েছিল। আমি লাফ দিয়ে উঠে পড়েছিলাম।

এখন তো বুঝতে পারি, সে আমার কিছুই করতে পারেনি। আমাকে জাপটে ধরেই তার সাধ মিটেছিল। আমি একছুটে বাড়ি। বাড়ি গিয়েই মাকে সব কথা বলে দিয়েছিলাম। মায়ের চোখ দুটো দপ দপ করে উঠেছিল। আমার দিকে যেন একবার দেখেছিল। তারপরে পিসিকে সব বলেছিল।

'সে এক কাণ্ড! পিসি গিয়ে শ্রীনাথের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে যেমন চিৎকার, তেমন খিস্তি। পাড়া বেপাড়ার লোক জুটে গিয়েছিল। শ্রীনাথের এক কথা, সে কিছু করেনি, আমি মিছে কথা বলছি। শুধু মিছে কথা না, আমার নামে যা তা বলেছিল। মড়াটা এমন মিথ্যুক, বলেছিল, ওর দোকান থেকে নাকি আমি ক্যাপ কিনতে গেছলাম একদিন। তখন কি ছাই জানতাম আমি, সে কি বস্তু। শ্রীনাথ আমার নামে তাও চালিয়ে দিয়েছিল। যারা ভিড় করেছিল, তারা শুনে হাসাহাসি করেছিল।

'তবে শ্রীনাথের কিছুই হয়নি। দু'একজন একটু আধটু ধমকে

দিলেও, বেশির ভাগ লোক কিছু বলেনি। বরং তারা পিসির খিস্তি খেউর শুনে বেশ মজা পেয়েছিল। মানুষ যে এমন হতে পারে, আমার জানা ছিল না। এখন বুঝতে পারি, কেন লোকেরা কিছুই বলেনি। আমার মায়ের জন্য সবাই চুপ করে ছিল। ভাল ঘরের মেয়ে তো আমি না। পিসির চরিত্রও সবাই জানত। আমার মায়ের কথাও কারোর অজানা ছিল না। অল্পসল্পেই ব্যাপারটা মিটে গেছল। পাড়ার মাতব্বর দু' একজন লোক শ্রীনাথকে একটু ধমকে ধামকে দিয়েছিল।

'তখন কথা উঠেছিল, আমাকে আর ইস্কুলে যেতে দেওয়া হবে না। আমি সে কথা শুনিনি। আমি তারপরেও পরীক্ষা দিয়ে আর এক ক্লাস উপরে উঠেছিলাম। তবে সেই ওঠাই সার। আর পড়তে হয়নি। কথাটা মনে পড়ল, প্রেমের জন্য। আমার বন্ধুরা প্রেম করত, ছেলেদের চিঠি লিখত। সেই সব চিঠিতে কত কী যে লেখা থাকত, আমাকে দেখতেও দিত। চিঠি পড়ে, আমিই যেন কেমন ন্যাকা বোকা হয়ে যেতাম। অথচ তাদের চেয়ে আমি যে কিছু কম জানতাম, তা না। কিন্তু কি করব, আমার সঙ্গে যে কোন ছেলের প্রেম হত, তা না। সেইজন্য ছেলেদের দিকে তাকিয়ে ভাবতাম, আমার দিকে কেবল চোখ খাবলার মতন চেয়ে দেখে। প্রেম তো করে না। আর সেটা হয় কেমন করে, তাও জানতাম না।

'একটা কথা বুঝতে পারতাম। যাদের চেনাশোনা বেশি, তাদের ওসব হত। আমাদের তো সেরকম চেনাশোনা ছিল না। আমাদের বাড়ীতে যারা আসত, তারা মায়ের লোক। তাদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা ছিল না। আমিও কারোর বাড়ী যেতাম না, লক্ষ্মীদের বাড়ি ছাড়া। আগে আগে আরো ছেলেবেলায় যেতাম। অনেক বাড়ীতে যেতাম বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করতে। তারপরে আর যেতাম না। কেউ পছন্দ করত না। কেন করত না তাও জানতাম। কণার মা তো একদিন সোজাসুজি বলেই দিয়েছিল, "এই মেয়েটা,

কি রে যখন তখন বাড়িতে আসিস ? যা বাড়ি যা, আর আসতে হবে না !”

‘অথচ কণার মা আগে ওরকম ছিল না। তবুও বুঝতে পারিনি। তাই মনে খুব লেগেছিল। পরে কণাকে বলেছিলাম। কণা বলেছিল ওর মা আমার সঙ্গে মিশতেও বারণ করেছে। সে জন্য আমার সঙ্গে লুকিয়ে মিশত। ওর প্রেমের চিঠি আমাকে না দেখিয়ে পারত না। আস্তে আস্তে পাড়ার অনেক বাড়িতেই আমার যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছল। লক্ষ্মীদের বাড়ীটা অন্যরকম। ওর বাবা ছিল ছুতোর মিস্তিরি। কারোর সাতে পাঁচে নেই। লক্ষ্মীও আমার সঙ্গে ছাড়া কারোর সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা করত না।

‘তবে প্রেম যে একেবারে হয়নি, তাই বা বলি কী করে। প্রেম হয়েছিল, প্রেম করেও ছিলাম। কিন্তু তার আগেই, জীবনের একটা দিক কেমন যেন ভেঙে চুরে গেছল। আজ বিশেষ করে, সেই কথাটা বারে বারে মনে পড়ছে।

‘তখন চৈত্র মাস চলছে। নতুন ক্লাসে সবে উঠেছি। মায়ের আদর খুব বেড়েছিল। মা প্রায়ই বলত, নুড়ি থাকতে আমার আখেরের ভাবনা কী ? তুই-ই আমাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখবি। কথাটা শুনতে ভাল লাগত। ভাবতাম আমার বিয়ে হবে। মা আমার কাছেই চিরদিন থাকবে। মা কিন্তু আর আমার বিয়ের কথা বলত না। বুঝতাম না, মা আর পিসি, আমার জীবনের সব ব্যবস্থা পাকাপাকিই কেরে রেখেছে।

‘চৈত্র মাস চলছে। তাত ফুটেছে। পিসি একদিন সকালবেলা বলল, সে এক জায়গায় যাচ্ছে। আমাকে তার সঙ্গে বেড়াতে নিয়ে যাবে। শুনে খুব খুশি হয়েছিলাম। সকালবেলাই নেয়ে টেয়ে, জোড়া বিনুনি করে, নতুন মেম ফ্রক পরে পিসির সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। আমাদের ছোট শহর থেকে মোটর বাসে করে গেছলাম। তা প্রায়

পনের ষোল মাইল হবে। একটা পাড়াগাঁ মত জায়গায় পিসি আমাকে নিয়ে নেমেছিল। চারিদিক ফাঁকা। মাঠ, গাছপালা, বাগান ভারি ভাল লেগেছিল।

'খানিকটা হেঁটে গিয়ে পিসি আমাকে নিয়ে একটা পাঁচিল ঘেরা বাড়িতে ঢুকেছিল। দোতলা বাড়ি। চারপাশে অনেকখানি জায়গা। তাতে আম, জাম, নারকেল, কত গাছ নিঝুম বাড়িটাতে যেন একটাও লোক নেই। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এ কাদের বাড়ি ?"

'পিসি বলেছিল, "দেখতে পাবি।"

'তখন কি জানি, আমার দেখতে পাবার জন্যেই, সেই বাগান বাড়িতে যাওয়া। বারান্দায় উঠে দেখেছিলাম, সামনের ঘরটা খোলা। আমরা গিয়ে দাঁড়াতে, একজন সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। চেনা লোক। আমাদের শহরের মস্ত বড় লোক। পীতাম্বর ভড়। সবাই পীতু ভড়, পীতু বাবু বলে ডাকত। লোকে বলত, শহরের অর্ধেক ব্যবসা তাঁদের শুনেছিলাম, তাঁদের রেশম আর সুতোর কাপড়ের কারখানা ছিল। বাড়িতে দোল, দুর্গোৎসব হত। শহরের মাঝখানে তাঁদের মস্ত বড় বাড়ি। দু তিন বার তিনি আমাদের স্কুলে গিয়েছেন। মাস্টারমশাই, দিদিমণিরা তাঁকে দেখলে যেন শশব্যস্ত হয়ে উঠত।

'সেই পীতুবাবু এসে সামনে দাঁড়াতে আমি যেন কেমন হকচকিয়ে গেছলাম। কালোর ওপরে মাজা রং। খুব লম্বা না, দোহারা শক্ত মত চেহারা। মাথার চুল শাদা কালো, পাতলা। পঞ্চাশের ওপরে বয়স হবে। ফুল কোঁচানো ধুতি আর সার্ট পরা ছিল। গলার স্বরটা বেশ মোটা। পিসিকে বলেছিলেন, "এসেছ ?"

'পিসি গুল্ মাথা কয়েকটা দাঁত বের করে হেসেছিল। আর পীতুবাবু আমাকে টেনে একেবারে তার গায়ে চেপে ধরে বলেছিলেন, "তুমিও এসেছ। এস এস।"

'একটু অস্বস্তি হলেও, আমার খারাপ কিছু মনে হয়নি। এত বড় লোক, বয়স হয়েছে। তিনি ওরকম আদর করে বলতে পারেন। গায়ের কাছে চেপে পিঠে একটা চাপড় দিয়ে ছেড়ে দিলেন। পিসিকে বলেছিলেন, "নন্দ, ওকে নিয়ে ওপরে এস।"

'পীতুবাবুর পেছনে পেছনে আমরা ওপরে গেছলাম। ওপর-তলাটা বেশ সাজানো গোছানো। একটা ঘর তো খুব সুন্দর। মস্ত বড় খাট, গদীওয়ালা বিছানা। গদী মোড়া চেয়ার, ঝকঝকে টেবিল। দেওয়ালে এত বড় আয়না আমি আর কখনও দেখিনি। নিজেকে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছিল। দেওয়ালে বড় বড় আলমারি। তাতেও আয়না বসানো। দেওয়ালের একটা জায়গায় একটা বন্দুক ঝুলছিল। আর সোনার মত মস্ত গোল একটা ঘড়ি টক টক করে চলছিল।

পীতুবাবু আমার গাল টিপে আদর করে বলেছিলেন, "ভাল লাগছে।"

'আমি ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিলাম, 'লাগছে।' তিনি বলেছিলেন "তাহলে ঘুরে ঘুরে দেখ। আমি একটু কাজ মিটিয়ে আসি।"

'পীতুবাবু চলে গেছলেন। আমি পিসিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এখানে কেন এসেছ পিসি?"

'পিসি বলেছিল, "তোকে যে পীতুবাবু নেমন্তন্ন করেছে।"

'অবাক হয়ে বলেছিলাম, "আমাকে? কেন পিসি?"

'পিসি বলেছিল, "কেন আবার। মানুষ মানুষকে নেমন্তন্ন করে না?"

'তা করে। কিন্তু পীতুবাবুর মত লোক, আমার বয়সী অচেনা একটা মেয়েকে নেমন্তন্ন করতে যাবেন কেন! আমি পিসির মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিলাম। তখনো কোন সন্দেহ করতে পারিনি। আমি আবার বলেছিলাম, "তাই কখনো হয় বুঝি।

আমাকে উনি চেনেন না, জানেন না, শুধু শুধু নেমন্তন্ন করতে যাবেন কেন ?"

'পিসি বলেছিল, "কে বলেছে তোকে চেনেন না। চেনেন বলেই তো নেমন্তন্ন করেছেন।"

'আমি অবাক হয়ে পিসির দিকে তাকিয়েছিলাম। এও কি সম্ভব, পীতাম্বর ভড়ের মত লোক আমাকে চেনেন! সেই বয়সে বেশি ভাববার মত মনের অবস্থা ছিল না। আর অল্প বয়সের একটা আলাদা মন থাকে। বিশেষ করে আমার মত সেই বয়সের মেয়েদের। ভেবেছিলাম, হয়তো সত্যি সত্যি পীতুবাবু আমাকে চেনেন। তবু মন থেকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারিনি। পিসি আমার কাছ থেকে সরে গেছল। আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি। একবার মনে হয়েছিল, হয়তো পীতুবাবু আমার মায়ের কাছে কোনদিন গিয়ে থাকবেন। আমি দেখিনি, উনি দেখেছিলেন। তবে আমাকে এমন মিষ্টি করে কাছে ডেকে নিয়েছিলেন, মনটা কেমন যেন গলেই গেছল। অমন বয়সের এত বড়লোক মানুষ। পীতুবাবুর নাম করতে লোক যেন কেমন একটু তটস্থ ভাব ছিল। তবে কেমন একটা খটকা। মনটা খচ খচ করছিল।

'দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম, বেলা দশটা। একজন চাকর মত লোক এসে আমাকে খেতে দিয়েছিল। জলখাবার। কত রকমের মিষ্টি, লুচি ভাজা। এত খাওয়া যায় নাকি! পিসি বলেছিল, "খেয়ে নে, ফেলিস না।"

'পিসির যেমন কথা। খাবারগুলো সবই ভাল। ওরকম করে আমাকে কেউ কোনদিন খেতে দেয়নি। তা বলে এত খাওয়া যায়। যা পেরেছিলাম খেয়েছিলাম। তারপরে সারা বাড়ি বাগান ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম। বাড়ির পিছন দিকে ঘাট বাঁধানো পুকুর ছিল। ঘাটে নেমে জল নিয়ে খেলা করেছিলাম। বাড়ি থেকে চান

করে গেছলাম। নাহলে আবার চান করতাম। আমি সাঁতার জানতাম।

'ঘাট থেকে উঠে আসবার সময়ে ওপরে চোখ পড়তে দেখেছিলাম, দোতলার বারান্দায় পীতুবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, "চান করবে?"

'আমি ঘাড় নেড়ে বলেছিলাম, চান করে এসেছি। একটু ভয় পেয়েছিলাম, লজ্জাও করেছিল। আবার মনটা খচখচিয়ে উঠেছিল এত বড় মানুষ আমাকে নেমন্তন্ন করেছে কেন? ঘুরতে ঘুরতে বাড়ির একদিকে গিয়ে দেখেছিলাম, সেখানে রান্না হচ্ছে। দুজন লোক রান্নাবান্নার কাজকর্ম করছে। একজনকে আগেই দেখেছিলাম, জলখাবার খেতে দিয়েছিল। পিসি তাদের কাছে বসে বসে গল্প করছিল। কাটা কাঁচা মাংস দেখেই চিনতে পেরেছিলাম, মুরগী রান্না হতে যাচ্ছে। আমার তখন মনটা ছাদের দিকে টানছিল। আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলা থেকে ছাদের সিঁড়িতে খানিকটা উঠে দেখেছিলাম, দরজার কড়ায় তালা বন্ধ। পেছন থেকে পীতুবাবু বলেছিলেন "ছাদে যাবে?"

'আমি যেন ভয় পেয়ে চমকে উঠেছিলাম। লজ্জাও করছিল। ঘাড় নেড়ে বলেছিলাম, "না।" পীতুবাবু বলেছিলেন, "না কেন? আমি চাবি খুলে দিচ্ছি, বেড়িয়ে এস।"

'বলে নিজেই চাবি নিয়ে এসে, আমার পিঠে হাত রেখে তুলে নিয়ে গেছলেন। তালা খুলে দিয়ে বলেছিলেন, "যাও, বেড়াও গে।" বলে নীচে চলে গেছলেন। আমার খুব অবাক লাগছিল। খুশিও হয়েছিলাম। আবার পীতুবাবুকে ভয়ও করছিল। এত বড় একটা ভার ভারিক্কি বড়লোক মানুষ। আমার সঙ্গে কী রকম করে কথা বলছিলেন। খানিকক্ষণ ছাদে ঘুরে, চারপাশে গ্রামটা দেখে নেমে এসেছিলাম। যে-ঘরে আলমারী আব খাট, সে ঘরে গেছলাম।

দেখেছিলাম, ঘরের এককোণে পীতুবাবু বসে আছেন একটা চেয়ারে। সামনের টেবিলে কয়েকটা বোতল আর গেলাম। আমি যেন একটু চমকে উঠেছিলাম। একটা বোতলের রঙ যেন আমার চেনা চেনা। আমাদের বাড়িতে দেখেছি। মাকেও খেতে দেখেছি। মদের বোতল।

'আমি চলে আসছিলাম। পীতুবাবু আমাকে বলেছিলেন, "নুড়ি শোন।"

'আমার সাধ্য ছিল না যে,অবাধ্য হব। আমি পায়ে পারে ওঁর —সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কাছের একটা চেয়ার দেখিয়ে বলেছিলেন, "বস না এখানে।"

'আমার বসতে সাহস হচ্ছিল না। উনি হাত ধরে আমাকে কাছে টেনে কোমর জড়িয়ে ধরেছিলেন। বলেছিলেন, "কি, ভয় লাগছে ?„

'আমি কিছুই বলতে পারিনি। বুকের কাছে ধকধক করছিল সত্যি। ওঁর মাথাটা আমার বুকের কাছে ঠেকছিল। সেটা যে ইচ্ছে করে, বুঝতে পারিনি। আমার লজ্জা করছিল। ওঁর যেন ওসব ভাবনাই নেই, এমনিভাবে আমার দিকে মুখ তুলে চিবুকে হাত দিয়ে বলেছিলেন, "ভয় কী, আমি তো আছি। আমাকে তোমার ভয় করে ?"

'করলেও কী পীতুবাবুর মতন লোককে সে কথা বলা যায়। আমি কথা বলিনি, ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিলাম, না। উনি অমনি আমার মুখটা দু' হাতে নামিয়ে ধরে ঠোঁটের ওপর চুমো দিয়ে বলেছিলেন, "লক্ষ্মী মেয়ে। খুব ভাল মেয়ে।"

'ঠোঁটের ওপর চুমোটা যেন কেমন লেগেছিল। তার আগে আমি জানতাম না, কেউ খায়নি। উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "তোমার কানে ফুটো, কিছু পরনি কেন ?"

'ভয় বা লজ্জা পাবার কোন রাস্তাই যেন ছিল না। আমি চুপ করেছিলাম। তখনো যেন সব ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। লজ্জা আছে, ভয়টা তার চেয়ে বেশি। উনি বলেছিলেন, "দুল, রিঙ্ কিছু নেই বুঝি? আচ্ছা এস, আমিই তোমাকে দিচ্ছি।"

'বলে আমার হাতটা ধরে একটা আলমারির কাছে নিয়ে গেলেন। আমি না বলতে চাইলাম, মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। উনি ছোট একটা বাকসো বের করে খুললেন। তার মধ্যে ঝকঝক করছিল দুটো সোনার রিঙ, তাতে ছিল কাঁটা। পীতুবাবুর হাত যেন একটু একটু কাঁপছিল। তিনি নিজের হাতে আমার কানে রিঙ্ পরিয়ে দিয়েছিলেন। এমন কি কখনো ভাবা যায়, পীতাম্বর ভড় আমাকে সোনার রিঙ কানে পরিয়ে দিচ্ছেন। মিছে বলব কেন, ভয় আর লজ্জার মধ্যে খুশিও হয়েছিলাম তিনি আমাকে টেনে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে বলেছিলেন, "দেখ তো, কেমন দেখাচ্ছে!"

'আয়নার দিকে চেয়ে আমি চোখ নামিয়ে নিয়েছিলাম। নিজের দিকে তাকাতে লজ্জা করেছিল। জিজ্ঞেস করেছিলাম, "বাড়িতে কী বলব?"

'পীতুবাবু হেসে উঠে বলেছিলেন, "কী আবার বলবে। বলবে, আমি দিয়েছি।"

'কোনরকম ছল চাতুরির ব্যাপারই ছিল না। তারপরেই উনি আমাকে বুকের কাছে জাপটে ধরে বলেছিলেন, "তা বলে বাইরের লোককেও বলো না যেন। তোমার মাকে বলবে।" আবার ছেড়ে দিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, "বা সুন্দর দেখাচ্ছে। এর পরে তোমাকে আমি একখানি সোনার হার গড়িয়ে দেব, কেমন?

'আমি কোন কথাই বলতে পারছিলাম না। এত আদর সোহাগ আমাকে মা ছাড়া কেউ কোনদিন করেনি। কোন লোক আমাকে

ওরকম বুকের কাছে চেপে চেপে ধরেনি। তাতে লজ্জা করছিল কিছু বলবার কথা মনে হয়নি। সাহসও ছিল না। উনি আবার আমার ঠোঁটে চুমো খেয়েছিলেন। ঠোঁটটা ভিজে যেতে আমার যেন কেমন একটু ঘেন্না ঘেন্না করছিল। পরের মুখের থুতু। হাত দিয়ে ঠোঁটটা মুছে ফেলেছিলাম!

'পীতুবাবু আমার হাত ধরে নিয়েই আবার সেই চেয়ারে গিয়ে বসেছিলেন। আমাকেও একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছিলেন। টেবিলের বোতল দেখিয়ে বলেছিলেন, "এসব চেন?" আমি ঘাড় নেড়ে একটা বোতল দেখিয়ে বলেছিলাম, "ওটা মদ॥,,

'উনি আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিলেন, "ঠিক বলেছ। খাচ্ছি বলে তোমার খারাপ লাগছে না তো?"

'আমি বলেছিলাম, "না।" খারাপ লাগবার কী ছিল। ওসবে আমার ভয় কেটে গেছল। পিসি ভাজা মদ খেত। মাও আস্তে আস্তে মদ খেতে শিখেছে। তবে ভাজা মদ না, এইরকম সোনালী রঙের। উনি আমাকে একটা সাদা রঙের বোতল দেখিয়ে বলেছিলেন, "এতে সরবত আছে, লেবুর রস দেওয়া। তোমাকে দিই একটু, খেয়ে দেখ।"

'আমার ভয় করছিল। পীতুবাবুর মুখের ওপর কথা বলতে পারছিলাম না। উনি কিসের সঙ্গে কী মিশিয়ে, জল ভরে আমাকে একটা গেলাস দিলেন। আমি চুমুক দিতে ভরসা পাচ্ছি না দেখে বলেছিলেন, "মুখে দিয়ে দেখ, খারাপ কিছু না। খারাপ লাগলে খেও না।"

'আমি মুখে দিয়েছিলাম। লেবুর রসের মত অনেকটা, একটু একটু ঝাঁজ ছিল। একটু একটু করে খেয়ে নিয়েছিলাম। তখন তো জানি না, কী খেয়েছি। শরীরের মধ্যে কেমন যেন একটা করছিল। খারাপ কিছু না। একটু যেন চমচমে ভাব। উনি

আমাকে আবার একটু দিয়েছিলেন। আমার আর খেতে ইচ্ছে করছিল না। বলেছিলেন, "খেয়ে নাও, দেখবে ভাল লাগবে।" পীতুবাবুর কথায় অবাধ্য হতে ভয় লাগছিল। একবার একটা চাকর এল। তাকে এমন ধমক দিলেন যেন বাঘের গর্জন। আমাকে ওরকম বললে বোধহয় অজ্ঞানই হয়ে যেতাম।

বাকী সরবতটুকু খেয়ে ফেলার পরে, উনি আবার আমাকে আদর করে বুকের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। আমাকে একেবারে দাঁড়িয়ে উঠে কোলের ওপর তুলে নিয়েছিলেন। নিয়ে চুমো খেয়েছিলেন। তারপর খাটের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "ঘুম পেলে ঘুমোও।"

'আমার ঘুম পায়নি। কেমন একটা ভয় আর অন্যরকম লাগছিল উনি আমার কাছ থেকে চলে গিয়েছিলেন। আমার ঘুম ঠিক আসছিল না। একটা কেমন যেন আমেজ মতন। টের পাইনি পীতুবাবু কখন দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। আবার আমার পাশে এসে বসে, গায়ে হাত রেখে বলেছিলেন, "কী গো নুড়ি, খারাপ লাগছে?"

আমি বলেছিলাম, "না।"

উনি আমার পাশে শুয়ে পড়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন আমার বুকে কোমরে, সাবধানে হাত দিচ্ছিলেন, আর গায়ের কাছে চেপে ধরছিলেন। তারপরে, যেন কিছুই না এমনি ভাবে, আমার জামার বোতাম খুলতে খুলতে বলেছিলেন, 'দেখি, এটা খুলে দিই।'

'আমি অবাক হয়ে একটু শক্ত হয়ে বলেছিলাম, "কেন?"

'উনি বলেছিলেন, "ওটা রাখতে নেই।"

'প্রায় জোর করেই, আমার জামা আর বডিস খুলে দিয়েছিলেন।

আর আমার বুকে মাথা রেখেছিলেন। ওঁর মাথার চুলগুলো এত শক্ত আর খোঁচা খোঁচা ভাবের ছিল, কম্বলের মত কুট কুট করছিল আমার বুকে। ভয়ে কিছু বলতেও পারছিলাম না। দুপাশে দুহাত ফেলে রেখে আমি চিৎ হয়ে শুয়েছিলাম। উনি আমার বুকে মাথা আর মুখ ঘষছিলেন। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। মাত্র তেরো বছরে পড়েছি তখন! আজ যা বুঝি, তখন সে সবের কিছুই বুঝি না। আমার কিছুই জানা ছিল না। কিন্তু উনি যখন আমার জামা খুলে নিয়ে ওরকম করছিলেন, তখন আমার আর বুঝতে কিছুই বাকী ছিল না। অথচ আমি যে আপত্তি করব, বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ব, সে সাহস ছিল না। একবার কেবল জিজ্ঞেস করেছিলাম, "পিসি কোথায়?"

'পিতুবাবু উপুড় হয়ে শুয়ে, আমার মুখের কাছে মুখ এনে বলেছিলেন, "তোমার পিসি আছে, ভয় নেই। খিদে পেয়েছে?"

'আমি বলেছিলাম, "না।"

'সত্যি তখন আমার খিদে পায়নি। অনেকগুলো মিষ্টি খেয়েছিলাম। আমার গাটা যেন গরম গরম লাগছিল। আমার ঠোঁট জিভ কান, সবই যেন কেমন গরম গরম লাগছিল! আমার লজ্জা করছিল, তবু বলতে পারছিলাম না, আমার গা-টা ঢেকে দেবার জন্য। উনি আমাকে বারে বারে চুমো খাচ্ছিলেন, যেমন করে খুশি, জিভে ঠোঁটে। আমি একবারও পীতুবাবুর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম না। জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আমাকে তোমার ভয় করছে?"

'আমি কোন জবাব দিইনি। জবাব দিতে ভরসা হচ্ছিল না। উনি আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমার খারাপ লাগছে না তো?"

'যত ছোটই হই, আমার মন বলছিল, "হ্যাঁ' বলা যাবে না। আমি ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিলাম, না। বেশ বুঝতে পারছিলাম, পিসি আমাকে সেখানে কেন নিয়ে গেছল। মনে মনে বুড়িটার ওপরে খুব

রাগ হচ্ছিল, মা-ও নিশ্চয় জানত। মা জেনে শুনেই আমাকে সেখানে পাঠিয়েছিল। পিসির সঙ্গে মায়ের ষড় ছিল। মনে বড় দুঃখ আর অভিমান হয়েছিল। আমার একটা দমকা নিশ্বাস পড়েছিল। পীতুবাবু যেমন খুবই ব্যস্ত হয়ে, খুব মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কী হল নুড়ি? কষ্ট হচ্ছে?"

'আমি মাথা নাড়িয়ে জানিয়েছিলাম, না। পীতুবাবুর মত লোক আমার সঙ্গে এমন করে কথা বলছিলেন, এত আদর করে কথা বলছিলেন, আমি রাগ করতেও পারছিলাম না। খাটের ওপর শুয়ে বাঁ দিকে ফিরলেন। একটা আয়নায় গোটা শরীরটা দেখা যাচ্ছিল। একটা ইজের পরা খালি গা শরীরটা দেখে, আমার খুব লজ্জা করছিল। সেই জন্য আমি বাঁ দিকে ফিরছিলাম না। ডান দিকে পীতুবাবু আমার কাছে উপুড় হয়েছিলেন, সারা গায়ে হাত দিচ্ছিলেন। যখন বুকে মুখ ঘষছিলেন, আমার যেন মাথা শুদ্ধ কী রকম করে উঠছিল। আমার যেন কেমন একটা ঘোর লাগছিল। সব সময় সবকিছু যেন খেয়াল থাকছিল না। একবার তাকিয়ে দেখলাম, পীতুবাবুর গায়ে কিছু নেই। আমার সামনে ওরকম অবস্থায় দেখব, কখনো ভাবিনি। আমি চোখ চেয়ে দেখতে চাইনি। চোখে পড়েছিলো তাই লজ্জা করেছিল! পীতুবাবু আমার কোন লজ্জা রাখেননি, নিজের লজ্জাও রাখেননি। তবে এখন তো বুঝি, ওঁর আবার লজ্জা কিসের। উনি ওরকম করবেন বলেই তো ঠিক করে রেখেছিলেন। তবু আমি আপত্তি করেছিলাম। ইজের চেপে ধরে বলেছিলাম, "না।"

'পীতুবাবু যেন আদরে গলে পড়ছিলেন, "লক্ষ্মীটি।"

'আমি তবু বলেছিলাম, "কেন?"

'উনি বলেছিলেন, "দেখই না।"

'সেই সময় বলাই কাকা আর কাকীমার কথা আমার মনে

পড়েছিল। কিন্তু তাদের কথা আলাদা। আমি ভাবতেই পারিনি। পীতুবাবু বলাই কাকার মত কিছু করবেন। আমি তো কত ছোট। আমার ধারণা ছিল, ওরকম কিছু হলে আমি মরে যাব।

কিন্তু আমি মরিনি। হে ঈশ্বর, তোমার মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হয়েছে। তুমি আমাকে যে কারণে এই জগত সংসারে এনেছিলে, আমি তোমার সেই কারণেই লেগেছি। আমি বেশ্যা হয়েছি। আমার মা পীতুবাবুকে দিয়ে এই জীবনের দীক্ষা দিয়েছিল। পীতুবাবু আমার প্রথম বাবু। আমার বাবা বেঁচে থাকলে পীতুবাবুরই বয়সী হতেন অথবা একটু কমই। সেই পীতুবাবুর দ্বারাই আমার বেশ্যা জীবনের শুরু হয়েছিল। তিনি আমার শরীরকে প্রথম কিনেছিলেন।

'চৌদ্দ বছর আগের সেইদিনের সব কথা আমার এখনো পরিষ্কার মনে আছে। পীতুবাবু যেন একটি পুতুলকে নিয়ে খেলা করছিলেন। এখন তো বুঝতে পারি, পীতুবাবুর শরীরে মনে তখন কত উত্তেজনা। তিনি যে আমাকে নিয়ে খেলা করছিলেন, তিনি যে আমাকে নিয়ে কী করবেন, যেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। আদরে সোহাগে কত যে আবোল তাবোল বকছিলেন। অথচ আমি কিছুই বোধ করছিলাম না। তিনি আমাকে কষ্ট দিতে চাননি। মাঝে মাঝে আমার শরীরটা কেঁপে উঠছিল! আমার খারাপ লাগছিল না। ভালও লাগছিল না।

'এখন জানি, তিনি কী চাইছিলেন আমার কাছে। তখন জানতাম না। জানতাম কেবল পীতুবাবুর যা ইচ্ছে হবে তাই করবেন। এখন বুঝতে পারি, পীতুবাবু বড় চতুর আর ঘুঘু লোক ছিলেন। জীবনে আমার মত অনেক তেরো বছরের নুড়ি পার করেছেন। তা-ই বা বলি কেন। মায়ের মুখে শুনেছি, তেরো বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল, চৌদ্দ বছর বয়সে আমি হয়েছিলাম। তেরো বছরের মেয়ে ছোট কিসে।

'সেই দিক থেকে হয়তো ছোট না। কিন্তু যে জীবনে কখনো কিছু করেনি, একটা আবছা আবছা ধারণা, মনে ভয় আর পাপ তার কাছে অনেক কিছু। পীতুবাবু সে হিসেবে গুরুদেব লোক। এখন বুঝতে পারি, কোথায় কী করছিলেন। আমার শরীরের মধ্যে শিউরে শিউরে উঠছিল। গায়ের মধ্যে কাঁটা দিচ্ছিল। হাত পায়ের ঠিক থাকছিল না পীতুবাবুর লজ্জা ঘেন্না বলে কিছু ছিল না। যে-মুখ দিয়ে মানুষ খায়, সে মুখের একটা ঘেন্না পিত্তি বলে কিছু থাকে। পীতুবাবু তো কুকুর ছিলেন না। কিন্তু কুকুরের মতই করেছিলেন। তখন কি আর ওসব জানি! এখন বুঝি, পীতুবাবু কী করছিলেন। তখন ঘেন্নাতে বলেছিলাম, "ও কি, না ওরকম করবেন না।"

'পীতুবাবু আমার কথা শোনেননি। তিনি পথ তৈরী করছিলেন তারপরে এসেছিল সেই মুহূর্ত। কিন্তু সেই মুহূর্তের মধ্যে আমার মনে প্রাণে কোথাও এতটুকু আনন্দ বা সুখ ছিল না। বলতে গেলে প্রায় অচেনা, অনেক বয়স্ক একজন লোক। মুখে তার মদের গন্ধ। গায়ে আতরের। আর আমি তেরো বছরের একটি মেয়ে, কোন কিছুর জন্যই আমার মন বা শরীর তৈরী ছিল না। পীতুবাবুর চতুর ঘাগী বুড়ো, তিনি তার কাজের রাস্তা করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে আমার কিছুই মনে হয়নি। বরং একটা ভয় ছিল। শরীর শক্ত হয়েছিল। পীতুবাবু বারে বারে সেই ভাবটাই কাটাতে চেয়েছিলেন, কাটাতেও পেরেছিলেন। আমার শরীরকে যেন তিনি অনেকটা তাঁর বশে নিয়ে গেছলেন। তাঁর নিজের দরকার মত।

'তবু সেই মুহূর্তে আমার বুকের মধ্যে ধকধক করছিল। আমি অন্যদিকে চেয়েছিলাম। আমি তো সবই টের পাচ্ছিলাম। ভয় লাগছিল, কিন্তু পীতুবাবু শান্ত ছিলেন। আমাকে খুব আদর করে কথা বলছিলেন। একসময়ে মনে হয়েছিল, পীতুবাবু যেন আমাকে

ঁধে রেখেছেন, আর তাতে তিনি স্বস্তি বোধ করেছিলেন। আমার
ঙ্গে অনেক গল্প করছিলেন। আমি কিছুই শুনছিলাম না। কখন
ওঁর হাত থেকে মুক্তি পাব সেই ভাবনা।

'কিন্তু মুক্তি বললেই মুক্তি আসে না। তিনি সমানে আদর সোহাগ
আর গল্প করে যাচ্ছিলেন। আমি নড়তে পারছিলাম না। এখন
বুঝতে পারি, আমার শরীর তো নিরেট পাথরের ছিল না। মাঝে
মাঝেই আমার শরীর কেঁপে উঠেছিল। আমি ওঁকে কয়েকবার অনুনয়
করে বলেছিলাম, "ছাড়ুন না।"

'পীতুবাবু ছাড়েননি তবু শেষ রক্ষা হয়নি। পীতুবাবু যত চালাক
চতুর ঝানু হন, শেষ পর্যন্ত আমি যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠেছিলাম।
মনে হয়েছিল, আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আমার তলপেটে
অজস্র ছুঁচ ফুটছে।

'বড় কেঁদেছিলাম পরে, কেবল যে ব্যথার জন্য তা না।
মায়ের ওপর রাগ করেই যে কেঁদেছিলাম কেবল, তাও না।
কারোকে বলে দিতে হয়নি, শিখিয়ে দিতেও হয়নি, মন থেকে
আপনিই মনে হয়েছিল, আমার আর কিছুই রইল না, আমার
সব গেল। কখন পিসি এসেছিল, কী বলেছিল, চেয়ে দেখিনি,
শুনিনি। খেতে বলেছিল, খাইনি। তার মুখ দেখতে আমার ঘেন্না
হয়েছিল। পীতুবাবু চলে গেছলেন। আমি কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে
পড়েছিলাম।

'কিন্তু সেই দিন রাত্রেও আমাকে পীতুবাবুর বাগান বাড়িতে
থাকতে হয়েছিল। কিছুতেই থাকব না বলে জেদ করেছিলাম।
পিসিকে তো একটা চড়ই মেরে দিয়েছিলাম। পীতুবাবু আমাকে
ঠাণ্ডা করেছিলেন, বলেছিলেন, "বেশ, তোমার যেতে ইচ্ছে হয়,
যেও। আমার কাছে তো গাড়ি আছে। খানিকক্ষণ থাক, খাওয়া-
দাওয়া কর। ভাল ভাল গানের রেকর্ড এনেছি। শোন। তারপরে

ভাল না লাগলে, গাড়ি করে বেড়াতে যেতে পার। তাতেও যদি ভাল না লাগে, তবে গাড়ি করে বাড়ী পৌঁছে দেব।"

'বলে পীতুবাবু একটি সরু সোনার চেন হার বের করে আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। অভাগী আমি, কানে ছুটো সোনার কাটি ছাড়া, তার আগে যে কখনো কিছু পাইনি। এবেলা ওবেলা ছু'ছুটো সোনার গহনা পেয়ে মনটা যেন কেমন গলে গেছল। তারপরেও, পীতুবাবু লাল রঙের একখানি রেশমী শাড়ী বের করে দিয়ে বলেছিলেন, "আজ থেকে শাড়ী পর। তোমাকে বেশ মানাবে।"

'গেরস্থের বৌ হোক আর বেশ্যা হোক, শাড়ি গহনায় মন ভোলে না, এমন মেয়েমানুষ কম। বিশেষ করে আমার সেই বয়সে। সেই বয়সে, ওসবের বরং মন বেশী ভুলত। তখন আর কী-ই বা চাইতে শিখেছি। পীতুবাবু অনেক কিছু বের করে দিয়েছিলেন। স্নো পাউডার সেন্ট আলতা। পিসি আমাকে সারা বিকেল সন্ধ্যে ধরে, একেবারে কনে বৌটি সাজিয়ে দিয়েছিলেন। পীতুবাবু দেখে বলেছিলেন, "এর পরে তোমাকে কয়েক গাছি সোনার চুড়ি গড়িয়ে দেব।"

'মিথ্যে বলব না। সাজগোজ করতে ভালই লেগেছিল। বাড়ি যাবার কথা আর বলতে পারিনি। কিন্তু পীতুবাবু যা করবার, তা-ই করেছিলেন। পরের দিন সকাল বেলা পীতুবাবু অনেকগুলো টাকাও দিয়েছিলেন। গহনা, শাড়ি, টাকা সবকিছু নিয়ে, পীতুবাবুর বাগান বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে এসেছিলাম, তখনও জানতাম না, আমি আর সেই নুড়ি নেই। আমার ভাল নাম হরিমতি। আমি আর সেই হরিমতীও নেই। আমার এখন একটাই পরিচয়, আমি বেশ্যা।

'এই আমি সেই বেশ্যা। এখন আমার নাম নুড়ি না। হরিমতী তো বড় সেকেলে, এখন আমার নাম বিজলী। কোথায় গেলেন সেই পীতুবাবু? পীতাম্বর ভড়? মারা গেছেন। প্রায় এক বছর পীতাম্বরবাবুর

কাছেই ছিলাম। কোন দিন আমাদের বাড়ীতে আসেননি। যখন ডেকেছেন, তখনই তাঁর বাগান বাড়ীতে গেছি। যতদিন থাকতে বলেছেন, থেকেছি। তা এক বছরে কিছু কম দেননি। বাড়িতে দুখানা পাকা ছাদ আঁটা ঘর তুলে দিয়েছিলেন। আরো খান কয়েক সোনার গহনা, ভাল ভাল শাড়ি, একটা গ্রামোফোন। এখনকার হিসেবে বলা যায়, সেই বয়সে কম কিছু না। তখন আর লোকেরও কিছু জানতে বাকী নেই, আমি কোন রাস্তা ধরেছি।

'সেই পীতুবাবু মারা গিয়েছিলেন তারও বছর দশেক বাদ। না জানলেও বুঝি, তারপরেও অনেক ছুঁড়িকে তিনি বাগান বাড়িতে ভোগ করেছেন। তবে আমার মত কোন মেয়েকে বেশ্যা জীবনে দীক্ষা দিয়ে গেছেন কিনা, জানি না। অর্থাৎ প্রথম খদ্দের।

'পীতুবাবু মারা গেছেন। আমার কাছে, আমার এই সাতাশ বছর বয়সের মধ্যে যত পুরুষ এসেছে, তারাও হয়তো কেউ কেউ মারা গেছে। আমিও একদিন মরব। সংসারে কেউই বেঁচে থাকবার জন্য আসেনি। তবে সকলের মরা আর বেশ্যার মরাটা বোধ হয় আলাদা।

'ভাবতে কেমন অবাক লাগে, আমাকে যারা ভোগ করেছে, তারা কেউ কেউ মারা গেছে। তারা কি আমার শরীরে কোন দাগ রেখে গেছে? না। জগতে মানুষের শরীর এমন এক জিনিস, তার ভেতরে কোন দাগ থাকে না। ওপরে যদি বা থাকে, ভেতরে ছাই পাঁশ যা-ই দাও, ধুয়ে ফেললেই সব পরিষ্কার। হাজার আতিপাতি করে খোঁজ, কিছু পাবে না। লোকে যেমন বলে, আমিও সেইরকম ভাবতাম। মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে একবার সহবাস করলে, তার দাগ আর ছাড়ানো যায় না। পুরুষেরাও বোধহয় তাই ভাবে। কিন্তু আনকোরা মেয়ে বলতে কি বোঝায়, তারা জানে না। যেমন আমরা জানি না, আনকোরা পুরুষ কাকে বলে। তবে হ্যাঁ, দাগ যদি কিছু থাকে, সেই মোক্ষম দাগ মেয়েদেরই থাকে। সেই দাগের নাম, সন্তান।

মেয়েদের শরীরের ভেতরে বল, বাইরে বল, ছেলে মেয়ে হলে কিছু দাগ সে রেখে যাবেই। আর দাগ রেখে যায় রোগ। পারা ইংরাজীতে যাকে বলে সিফিলিস আর গণোরিয়া।

'এই সিফিলিস রোগটি আমার একবার হয়েছিল। তখনো আমি কলকাতার এ পাড়ায় আসিনি। বাড়িতেই তখন আমার দেহবৃত্তি চলছিল। পীতুবাবুর কোন রোগ ছিল না, আমি জানি পীতুবাবু বড় সেয়ানা মানুষ, মেয়ে দেখে বাজিয়ে নিতেন। তাঁর মেলাই অনুচর। নানান জায়গা থেকে নানান চরেরা তাঁর জন্য মেয়েমানুষ খুঁজে আনত। পরে পীতুবাবুর অনেক কাণ্ডই তো দেখেছি, তাঁর বাগান বাড়িতে। আমি থাকলেও, অন্য মেয়েরাও থাকত। ও বাবা, সে কি র‍্যালা। এখন সব জানি, বুঝি। তখন কি জানতাম? সোমত্ত বাঁজা বউ, কড়ে রাড়ি, বাঙাল কলোনীর ডাঁসা ডাঁসা মেয়ে। অনেককেই দেখেছি সেই বাগানে থাকতে। তা বেশ্যা হই, আর যা-ই হই, ছেলেবেলার সে সব কথা মনে হলে, এখনো এই পোড়া শরীরের মধ্যে যেন শিরশির করে। বন্ধ ঘরে। কারোর গায়ে জামা কাপড় নেই। মদের ঢল নেমেছে। কুকুর বেড়ালের মতন আমার সামনেই পীতুবাবু অন্য মেয়ের সঙ্গে, যা খুশি তাই করছেন। যতোই মুখ সাপাটি করি, ওসব দেখলে শরীর মন ঠিক থাকত না। মন চাক বা না চাক, শরীর যেন বশে থাকতে চাইত না। আবার পীতুবাবুর ওপর রাগও হত। আমার সামনে এসব কেন?

বলেছি পীতুবাবু বড় ঝানু লোক, বড় ঘুঘু ছিলেন! তিনি একজনকে দিয়ে দেখিয়ে আর একজনের কড়ায় তেল ফোটাতেন। সময় হলে ভাজতেন। সে সব অন্ধিসন্ধি তাঁর খুব ভাল জানা ছিল। গুয়ের পোকা যেমন গু ছাড়া থাকতে পারে না, পীতুবাবু তেমনি মেয়েমানুষ নিয়ে থাকতেন। অন্যদের কেমন করে সেই পোকা করতে হয়, তাও ভাল জানতেন। মিছে বলব না, সেই যে প্রথম

দিন পীতুবাবু আমার সব কিছু নিলেন, তা নিলেন তো একেবারে, চেঁচে পুঁছে নিলেন। একটু একটু করে, তিনি আমার শরীরে এমন বিষ ঢুকিয়েছিলেন, পনরো বছর বয়সের মধ্যে, আমিও গুয়ের পোকা। আমি বেশ ভালই রপ্ত করেছিলাম। তবে একটা কি ব্যাপার, আমি থাকলে, আমাকেই উনি সব থেকে বেশি খাতির যত্ন করতেন, সকলের থেকে আমাকে আদর সোহাগ তোষামোদ বেশি। আমার ওপরে কেউ না। তাতে আমার মনে মনে বেশ গুমোর হত। অন্য মেয়ে বউরা আমাকে সিংসে করত।

'পীতুবাবুর অনেক ঘটনা বলতে গেলে, আমার গোটা খাতায় কুলোবে না। আসল ব্যাপার বুঝেছি। শরীরে একটা সুখের আগুন আছে। তাকে যত রকমে জ্বালাবে, ততই সে জ্বলবে। বই পড়তে বরাবর ভালবাসি। কিছু কিছু বই পড়ে দেখেছি, ও সবকে বলে বিকার। ওতে মানুষের ঘেন্না পিত্তি বলে কিছু থাকে না। তবে হ্যাঁ, এ কথাও বলব, পীতুবাবু আমাকে দেখিয়ে যে কাণ্ড করুন, আমাকে নিয়ে সে সব করতেন না। যেমন জ্যোছনা রাত্রে পুকুরের ঘাটে গায়ে সাবান মেখে, পাঁকাল মাছের খেলা। দেখে হাসিও পেত, রক্তও তেতে উঠত।

'কিন্তু পীতুবাবুর বাগান বাড়িতে রোজ যাওয়া হত না। উনি কখনো আমাদের বাড়ি আসতেন না। আমাদের পাড়ায় ঢুকতেন না। সেয়ানা লোক। সবাই সব কিছু জানলেও, চোখের সামনে ধরা দিতেন না। লোকেরা তো চোখে ঠুলি এঁটে থাকত না। নুন দিয়েই ভাত খায়। সবাই সব কিছু কিছু বুঝত। লোকে মনে করত, আমি পীতুবাবুর রক্ষিতা। তা একরকম তা-ই বলা যেত। তবু আমি কি আর কিছু করতাম না? লোকেই বা ছেড়ে দেবে কেন? লোকেরা যদি বা ছাড়ে, আমার মা, নন্দ পিসি ছাড়বে কেন? ষোল বছর বয়সে, আমি রোজগেরে মেয়ে। পিসি কোথা থেকে বাবু

ধরে নিয়ে আসত। তা ছাড়া জুটেছিল বেন্দা। বৃন্দাবন, যার সঙ্গে হাজরাদের পোড়োয় খেলেছিলাম। যে খেলা আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে গেল, যে খেলা আমার অন্ন জল হল। কণার বেলায় তা হল না, ভগবান আমাকে পাপ দিলেন।

'একদিন সাঁজবেলায়, বেন্দা বাড়িতে এসে হাজির। ও বামুনদের ছেলে, বললো, লেখাপড়া করে। আমার থেকে দু' তিন বছরের মাত্র বড়। আমি অবাক। কী ব্যাপার? বেন্দার হাসি দেখে বুঝেছিলাম, ব্যাপার কী। মা পিসি খুব রেগে গেছল। বেন্দা আমার বাবু হয়ে আসেনি। ছেলেবেলার বন্ধু, ভাবের মানুষ, ওর এক কথাতেই সব বুঝেছিলাম। যখন ও বলেছিল, চল মুড়ি, হাজরাদের পোড়োয় যাই। আমার খুব হাসি পেয়েছিল, আমি ওর গায়ে চিমটি কেটে দিয়েছিলাম। ও লুকিয়ে আমাদের বাড়ি ঢুকেছিল। কেউ দেখলে বাড়িতে বলে দেবে। তা হলে বেন্দার রক্ষা ছিল না। বাড়ি থেকে পিটিয়ে বের করে দিত। পীতুবাবুর বাগান বাড়ি যাওয়া শুরু হওয়ার পর থেকে, ওর সঙ্গে রাস্তায় আমার কয়েকবার দেখা হয়েছে। আমি রাস্তায় কমই বের হতাম। সিনেমা টিনেমা দেখতে হলে বেরোতাম। পিসিমা এমন একটা ঠাট বজায় রাখত, যেন আমি যে সে মেয়েমানুষ না, পীতম্বর ভড়ের মেয়েছেলে বলে কথা। প্রথম প্রথম ঘটনাটা যখন জানাজানি হল, বেন্দা আমার সঙ্গে দেখা হলে কথা বলত না। রকের ছেলেরা আওয়াজ দিত, পীতে ভড়ের রাঁড় যাচ্ছে। আমি মনে মনে যা তা গাল দিতাম, তোদের বাপের কীরে, আমি যারই রাঁড় হই। মরতে আসিস, পীতে ভড়ের মতন দিস, তোদের রাঁড়ও হব।

'তারপরে, বেন্দা আমার সঙ্গে কথা বলত। যেন কেউ দেখতে শুনতে না পায়, এ ভাবে বলত। কিন্তু বেন্দা যে কোনদিন আমার কাছে বাড়িতে আসবে, ভাবতে পারিনি। আমার মনে খুব আনন্দ হয়েছিল। মা আর পিসি বেন্দাকে মোটেই ভাল চোখে

দেখেনি। দুজনেই ভুরু কুঁচকে, টেরচে ব্যাপারটা দেখেছিল। আমি বেন্দাকে নিয়ে ঘরে বসিয়েছিলাম। আর বেন্দার প্রথম কথাই, চল্ নুড়ি, হাজরাদের পোড়োয় যাই। আমি আর হেসে বাঁচি না। বলেছিলাম, "পোড়োয় কেন, ঘরেই বস না।" বেন্দা আমার দিকে এমন করে তাকিয়ে দেখছিল, সেটা ঠিক পীতুবাবুর মতন না। পীতুবাবু হলেন বুড়ো ভাম। বেন্দা অত কেতা জানবে কি করে আমার দিকে তাকিয়ে, বেন্দার যেন জ্বর হয়েছিল। চোখ ফেরাতে পারছিল না। লাল চোখ। স্থির হয়ে বসতে পরছিল না। জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কি দেখছিস?" বেন্দা বলেছিল, "নুড়ি, তুই দারুণ দেখতে হয়েছিস।"

'সেটা আমি জানতাম। আমার মা আর পিসি তার থেকে বেশি জানত। আমাদের ছোট শহরের অনেক টাকাওয়ালা ভদ্রলোকেরা তখন আমাকে রাখতে চেয়েছিলেন। কাকের মুখে খবর রটে যায় তো। পিসি বলেছিল, কারোর কাছে ও মেয়ে থাকবে না। তবে হ্যাঁ, তোমার ইচ্ছে হয়, এক আধ দিন ঘুরে যেও। এসব শুরু হয়েছিল, আমার ষোল বছর বয়সের পর। তার আগে, আমি পুরুষ বলতে পীতুবাবুকেই জানতাম। আমার কাছে যারা আসত পিসির মারফত আসত। বেশির ভাগই আমাদের শহরের লোক না। পিসি খুব ঘুণ। শহরের লোক হলে পীতুবাবুর কানে যাবে। তাহলে পীতুবাবু আর আমাকে ডাকবেন না, কিছু দেবেন না।

'বেন্দাকে পেয়ে আমার এত ভাল লেগেছিল, কথাবার্তায় কখন আমরা হুড়যুদ্ধ ছেলেমানুষি আরম্ভ করেছিলাম, মনে নেই। তবে ছেলেমানুষি আলাদা। বেন্দা আমাকে জড়িয়ে ধরবার জন্য, চুমো খাবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। আর আমি খাটের এ-পাশ ও-পাশে ছিটকে পড়ছিলাম। বেন্দার অবস্থা খুব খারাপ হয়েছিল। মদ না খেয়ে মাতাল, খাটের গায়ে কপাল ঠুকে ঢিবি। দেখে মায়া হলেও আমি খুব হেসেছিলাম। ঘরের দরজা খোলাই ছিল। আমাকে পিসি

ডেকে বলেছিল, মা আমাকে ডাকছে। আমি মায়ের কাছে গেছলাম। মা রেগে উঠে বলেছিল, 'বেন্দা ছোঁড়া এখানে কী করতে এসেছে? এখনো কলেজে পড়ে, এক পয়সার যুগ্যি না।" আমার কেমন রাগ হয়ে গেছল, বলেছিলাম, "বেশ করেছে এসেছে। ও আমার বন্ধু। পয়সার যুগ্যি নাই বা হল। পিসি বলেছিল, "বন্ধু আবার কিসের। ওকে টাকা দিয়ে যত খুশি বন্ধুগিরি ফলাতে বল, কিছু বলব না। জানিস না, তোর মুখ দেখে লোকে ঘরে এসে টাকা দিয়ে যায়। আমি বলেছিলাম, "দিক গে। বেন্দার সঙ্গে, তাদের কি কথা। লোকেদের সঙ্গে কি আমি ছেলেবেলায় খেলা করেছি।" মা আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। আমি বুঝতে চায়নি। একবার লাইনে এলে, আর নাকি বন্ধু টন্ধু রাখতে নেই। রাখতে হলেও সেইভাবে রাখতে হবে, যাতে তাকে দেখানো যায়, যে লাইনে যে দস্তুর। কিছু যদি না আদায়ই করতে পারলাম, তাহলে আর ওসব করে কী হবে।

'কথাটা ঠিক। কিন্তু তখন বুঝিনি। আমাদের এক বন্ধু সার, এই শরীর। যে যেভাবেই আসুক, একটি ছাড়া কেউ কিছু চাইবে না। আর এই শরীরের জন্যই যখন, অন্ন জল থেকে গায়ের কাপড়টি পর্যন্ত, তখন এমনি এমনি এ শরীর দেওয়া চলে না। কথায় বলে, ভাত কাপড় দিতে পারে না, কিল মারার গোঁসাই। গেরস্থ ঘরের বউ যদি স্বামীকে একথা বলতে পারে, আমরা খদ্দেরকে তো বলবই। ডাক্তার এমনি ওষুধ দেয় না। উকিল বিনা পয়সায় মামলা লড়ে না। যার যা আছে, সে তা-ই দিয়ে পয়সা নেয়। আমার শরীর দিয়ে পয়সা, সে কথা ভুললে কি চলে।

চলে। তবু ভুলিনি কী? ভুলেছি। মন গুনে ধন, দেয় কোন জন! মন ভুললে, সবই ভুল। শরীর দেওয়া তো দূরের কথা, টাকা পয়সা, সবই দিতে ইচ্ছে করে। সে হল মনের ব্যাপার। আমাদের মতন মেয়ের জীবনে, ওসব বড় খারাপ। ভাল কখনো

হয় না, মন্দ ছাড়া। ও একটা অনাসৃষ্টি। তবু সবসময় মন মানে না।

'বেন্দার বেলা আসলে আমার অন্য ব্যাপার হয়েছিল। আমি যে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলাম, তার কারণ, পীতুবাবু ছাড়া আর কারোর সঙ্গে কেন মিশব না? তাছাড়া বেন্দার সঙ্গে, ছেলেবেলার কথাটা ভুলতে পারিনি। তাই মা আর পিসির সঙ্গে ঝগড়া করে আমি ফিরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু বেন্দা অল্প বয়সের জোয়ান হলে কী হবে। কিছুই জানত না। রক্তের তেজই সব না। কারিগরি জানা চাই। বেন্দা সেসব জানত না। তবু আমার ওকে ভাল লেগেছিল। তারপর থেকে বেন্দা প্রায়ই আসত। প্রায় তিন বছর ও প্রায়ই আসত। তা নিয়ে অনেক হুজ্জোতি হয়েছে মা পিসির সঙ্গে। কিন্তু আমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না। আমি আর সে নুড়ি ছিলাম না। তবে আস্তে আস্তে বেন্দার ওপরে মনটা থিতিয়ে এসেছিল। মাঝে মাঝে শুধু গল্প করে ওকে বিদায় দিতাম। তখন পীতুবাবুর বাগানবাড়ির ডাক না থাকলে আমার ঘরে প্রায়ই লোক আসত। আয় টায় বেশ ভালই হচ্ছিল। পীতুবাবু কোঠা ঘর করে দিয়েছিলেন। আমি বিজলী বাতি এনেছিলাম। ঘর দরজার চেহারা বদলে গেছল। একদিন বেন্দাকে বললাম, "কাল আমাকে একশো টাকা দিস তো, একটু দরকার হয়েছে।"

'ইচ্ছে করেই বলেছিলাম, দেখি বেন্দা কি করে। মুখে তো খুবই ভালবাসা দেখায়। কানে শুনতাম, ও অন্য মেয়েদের সঙ্গে মেশে, তাদের সঙ্গে সিনেমায় যায়, কলকাতায় বেড়াতে যায়। ও তো গরীবের ছেলে না। কিন্তু একদিন দু'পয়সার বাদাম ভাজাও এনে খাওয়ায়নি। টাকা চাইবার পরে, চারদিন বেন্দা আমাদের চৌকাঠ মাড়ায়নি। তারপরেই ও একজনকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। সাহেবি পোশাক পরা দেখতে সুন্দর এক ছোকরাকে নিয়ে।

শুনেছিলাম, দিল্লীতে থাকে, বেন্দার খুব বন্ধু। আমার সঙ্গে মিশতে চায়। ছোকরা এক কথাতেই একশো টাকার নোট বের করে দিয়েছিল। সঙ্গে করে এনেছিল বিলিতি মদের বোতল। বেন্দা নিজেই পিসিকে ডেকে একগোছা টাকা দিয়ে বলেছিল, মুরগীর মাংস তৈরি করতে আর মিষ্টি আনতে। মা পিসিও খুব খুশি হয়েছিল। বেন্দারও সেদিন খুব খাতির হয়েছিল। ওর বন্ধু লোকটিকেও আমার খারাপ লাগেনি। কিন্তু লোকটা আমাকে জজিয়ে গিয়েছিল।

'আমার হিসেবে ভুল হয়নি। বেন্দার বন্ধু সেই লোকটিই আমাকে রোগ দিয়ে গেছল। অবশ্য হলফ করে রোগের বিষয়ে বলা যায় না। কিন্তু আমার কাছে তখন যারা মাঝে মধ্যে আসত, তারা পরেও এসেছে, আমার অসুখ করেনি। সেই লোকটির ফরসা টকটকে মুখে আমি কয়েকটা লাল মতন পোড়া পোড়া দাগ দেখেছিলাম। সন্দেহটা আমার সেইজন্যই। তারপরেও বেন্দা কয়েকজনকে নিয়ে এসেছে। তারপরে ও নিজে থেকেই সরে গেছল।

'রোগটা প্রথমে টের পেলাম, আমার তলপেট আর তলপেটের নিচেই কুচকি ঘেঁষে দুটো লাল ফুসকুড়ি মতন দেখে। কোন জ্বালা যন্ত্রণা ছিল না। কিন্তু আমার শরীরে কেমন একটা বেভাব। কেমন যেন ঝিম ঝিম ভাব, গা হাত পায়ে পিত্তি পড়ার মতন জ্বালা জ্বালা করে। প্রথমে ফুসকুড়ি দুটোকে পাত্তা দিইনি। ভেবেছিলাম, গরমে গোটা হয়েছে, সেরে যাবে। সেরে তো যায় নি, আরো বড় হচ্ছিল। তারপর একদিন মাকে দেখিয়েছিলাম। মা দেখিয়েছিল পিসিকে। পিসি মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল। বলেছিল, "সর্বনাশ, তোকে পারা দিল কে?" তারপরেই চিকিৎসা শুরু হয়েছিল। শহরের এক বড় ডাক্তার দেখেছিলেন। আমার হাতের শিরা থেকে রক্ত নিয়ে, কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল। তারপরেই ইনজেকশন বড়ি চলছিল। খাওয়া দাওয়া বদলে দেওয়া হয়েছিল। আমি

খুব ভয় পেয়েছিলাম। তখন আমার কুড়ি বছর বয়স। ভেবেছিলাম, বাঁচব না। মাকে মাথা চাপড়ে কাঁদতে দেখেছি। আবার পিসিকে একথাও বলতে শুনেছি, "কাঁদিস না বউ। আজকাল এ রোগের ভাল চিকিচ্ছে বেরিয়েছে, নুড়ি সেরে যাবে। লাইনে থাকতে গেলে, ওরকম এক আধবার অসুখ করে। যে লাইনের যা ব্যামো। কার আছে না আছে, সব সময় তো আর বোঝা যায় না।"

'জানি না, এ রোগ একবার ঢুকলে চিরদিনের মতন সারে কিনা। তবে আমার সেই ফুসকুড়ি মিলিয়ে গিয়েছিল। বেশ কিছুকাল চিকিৎসার পরে, আমার শরীরও ভাল হয়ে গেছল। তারপর সে কি, ওসব আর কখনো হয়নি। অনেকে ভয় দেখায়, ওসব রোগ একবার শরীরে ঢুকলে, আর কখনো নাকি সারে না। দশ বিশ বছর বাদে আবার ফুটে বেরয়। কী জানি! সাত বছর তো হল, কিছু হয়নি। শরীর বেভাব হলেই ডাক্তার দেখাই। আমার কাছে এক ভদ্রলোক আসেন, রেলের বড় অফিসার। তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন, আমি যেন মাঝে মধ্যে রক্তটা পরীক্ষা করাই। সে কথা আমি মেনে চলি।

'এখন আমার মনে হয়, আমার ভেতরে দুটো দাগ আছে। একটা আমার মরে যাওয়া ছেলে, আর একটি সেই রোগ। এখন আমার শরীরের ভেতরে রোগ নেই, তবু মনে হয় রোগটা আমার ভেতরে দাগ রেখে গেছে। মনের কথা আলাদা। যেমন পীতুবাবুকে আমি কখনো ভুলব না। পীতুবাবু হলেন সেই দেবতা, যাঁর কাছে আমাকে প্রথম বলি দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে কি আমি কখনো ভুলতে পারি আজ বাড়িওয়ালীর ঘরে যে মেয়েটিকে আনা হয়েছে, জানি না, এই তার প্রথম বলি কিনা। অনেক মেয়েকেই, এ পাড়ায় এসে বলি হতে দেখলাম। এখানকার বলি বড় পাষণ্ড! দরজায় কে শব্দ করছে ···।'

বলতে গেলে একটি অধ্যায়ের এখানে শেষ। আমি খাতাটা বন্ধ করে চোখ বুজে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। একটি মেয়ের দেহ জীবিকার প্রথম সূচনা থেকে: অনেক খানি ব্যক্ত হয়েছে। একটানা এতটা লেখা আর আছে কিনা জানি না। একদিনের মধ্যে এতখানি লেখাটাও কম কথা না। লেখিকা কেন এতটা লিখেছিল। তার কারণ বর্ণিত হয়েছে। অনিবার্য শারীরিক কারণে, তখন তার দেহ বিশ্রাম করছিল। তার কিছু করার ছিল না, 'কেন লিখছিল' তার বাড়ীওয়ালীর নতুন বালিকার বলিদান ঘরে, একটি উপলক্ষে তার নিজের প্রথম বলির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

খাতার লেখিকা যা লিখেছে, তার নিজস্ব ভঙ্গিতে। সেই কারণেই অনায়াস। কোথাও কোন বড় কথা নেই। কিন্তু আমার আশ্চর্য লাগে, কোথাও তেমন করে যেন, কোন রাগ বা ঘৃণা জ্বলে ওঠেনি। উঠেছিল, তার মাকে যখন সে পিতার মৃত্যুর মাত্র পাঁচ মাস পরে, বৃত্তি গ্রহণ করতে দেখেছিল। সেই অংশে সব থেকে করুণ ব্যাপার বোধ হয়। বালিকার মনে পিতার স্মৃতি তখনো উজ্জ্বল। পিতার স্মৃতি বোধ হয় তার মনে বরাবরই উজ্জ্বল। কারণ, সে যখন কলকাতার তথাকথিত লালবাতি এলাকায় দেহবৃত্তি করতে এসেছিল, তখন তার ঘরের দেওয়ালে পিতার ছবি রাখার উল্লেখ রয়েছে। আর সব নিষ্ঠুর, ভয়াবহ ঘটনাগুলো সে এমনভাবে ব্যক্ত করেছে যেন তা খুবই স্বাভাবিক। অবিশ্যি সমস্ত ব্যাপারটাই খুব সরল আর অমানুষিক। পরবর্তীকালে পীতাম্বর ভড় নামক ব্যক্তির কাছে যে তাকে প্রথম বলি দেওয়া হয়েছিল, সে নিজেই লিখেছে।

আমার অবাক লাগছে, এই সরল লেখার মধ্যে হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ, রাগ দুঃখ যন্ত্রণা এবং পাপবোধ অনায়াসে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বলি দিতে হয় না। খাতার লেখিকার মধ্যে একটি গুণ আছে, নিজেকে প্রকাশ করবার মতো। লিখে বলবার ভাবগুণও তার ছিল। জানি

না, তার মুখের ভাষার কতখানি বাঁধুনি ছিল। এক জায়গায়, সামান্য দু'এক লাইনেই জানা গিয়েছে, সে বই পড়তে ভালবাসত। এবং পীতাম্বর ভড়ের বাগান বাড়িতে যা ঘটত, তা যে যৌন বিকৃতি, একথা সে পরে বই পড়ে বুঝতে পেরেছিল। জানি না, সে কি বই পড়েছিল এবং কী ভাবে সিদ্ধান্তে এসেছিল সেসব ঘটনা ছিল বিকৃত। বিকৃত নিশ্চয়ই। শৃঙ্গার এক ক্রিয়া। কিন্তু একাধিক রমণীর সঙ্গে, একত্রিত হয়ে যে যৌন চক্র সৃষ্টি করা হত, তা নিঃসন্দেহে বিকার!

এই খাতা পড়লে স্বভাবতই, খাতার লেখিকা সম্পর্কে মনে কৌতূহল জাগে। সে তার ছেলেবেলার অনেক কথাই মনে রেখেছিল। বিশেষতঃ বৃন্দাবনের সঙ্গে ছেলেবেলায় হাজরাদের পোড়োর খেলা। তার ধারণা, সেই যে সাত আট বছরের মেয়ে সে নগ্ন হয়ে, আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়েছিল, সে নগ্ন শয়নই তার অক্ষয় হয়ে চলছে। সে আর কোনোদিন তার নগ্নতা ঘোচাতে পারেনি। পাপবোধ থেকেই সে একথা বললেও, তার বান্ধবী কণা একই কাজ করে কেন ঘর বর সবই পায়? এ প্রশ্নেও ঈশ্বরের কাছে তার চিরদিনের জন্য রয়ে গিয়েছে।

আমি আবার খাতাটা নিয়ে পাতা ওলটালাম। কতকগুলো অর্বাচীন গানের কলি একটি পাতায় লেখা রয়েছে। মনে হয়, এসব গানের কলি সে কলকাতায় গিয়ে শুনেছিল। হয়তো খাতার পাতা খুলতে গিয়ে এই পাতাটাই খুলেছিল আর লিখতে আরম্ভ করেছিল। যদিও বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো, তবু মনে হয়, কথাগুলো মনে করে করে লিখেছিল। যেমন একটি কলি, 'কাঁটা মেরে মোটা মাগুর পালিয়ে গেছে অগাধ জলে···।' কিংবা, 'কি করে জানলে তুমি লোহা গালাতে···।' বা 'শিখর বাহন কোথা গেলি, বকনা ডাকতে লেগেছে···' ইত্যাদি। গানের কলিগুলো পড়লে স্পষ্টই বোঝা যায়, তার পরিবেশে এসব গানের প্রচলন ছিল। হয়তো পরিবেশিত

হত না, অবকাশের সময়ে নিজেরা নিজেদের শুনিয়ে হাসি মস্করা করে গাইত। আবার এমন গানের কলিও দেখেছি, যা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব এবং রুচির। যখন একটি মাত্র গানের কলিই ছিল 'তুমি বড়ই নিদয় হে, হিদয় পানে চাহ না…।'

তারপরে দু তিন পাতা উল্টেই দেখি, এইরকম লেখা রয়েছে ঃ 'ইচ্ছে ক'রে শালাকে জুতো পেটা করি। সত্যি কি আর জুতো পেটা করব ? এতবড় একটা মানুষ। এক একসময় আমাকে এমন ক্ষেপিয়ে তোলে। মনে হয় জুতো মারি। রাগ করে না, আদর করে। লোকে শুনলে কী ভাববে ? আদর করে আবার জুতো মারা যায় নাকি ? আমি তো জানি, যায়। যে লোক নিজে আলনার নিচে থেকে আমার চটি নিয়ে নিজের গালে মারে আর বলে, "বিজলী, আমাকে জুতো পেটা করো," তার সম্পর্কে এরকম ভাবা যায়। লোকটি বড় ব্যবসায়ী, মস্ত বড় গাড়ি নিয়ে আসে, নাম রাজেশ্বর। রাজেশ্বরের মুখেই শুনেছি, ওরা নাকি বাঙালী না। কয়েক পুরুষ এদেশে আছে, তাই বাঙালীর মতন হয়ে গেছে। কিন্তু বিয়ে থা যা কিছু, সব নিজেদের দেশ ঘর জাতের সঙ্গে। না বললে, কোনদিন বুঝতে পারতাম না।

'রাজেশ্বর এ পাড়ায় এলে, আমার ঘরেই আসে। মাঝে মাঝে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আসে। মদের ফোয়ারা ছোটায়। খাবারের ছড়াছড়ি যায়। রাজেশ্বর যেমন দিলখোলা, মনটাও তার ভাল। কিন্তু এক বাতিকে ওর সব গোলমাল করেছে। মাতামাতি নাচানাচি অনেকেই করে। তা বলে তোমার সামনে ল্যাংটো হয়ে নাচতে হবে নাকি ? মনে আছে, সে প্রথম যেদিন এল, তা বছর তিনেক হবে, বলে কিনা, "আমাকে নেকেড ড্যান্স দেখাও।" আ মরণ! একে নাচ, তা আবার ল্যাংটো। আমি অমনি দরজা খুলে দিয়ে বলেছিলাম, "অন্য ঘরে দেখুন, আমার ঘরে ওসব চলবে না।"

'অনেক আছে, আলো না জ্বালালে তাদের সুখ নেই। যা করবে আলো জ্বালিয়ে। সেটা না হয় মেনে নেওয়া গেল। আমাকে তুমি দেখবে? তা দেখ না। অনেকেই দেখেছে, দেখবার জন্যই তো আছি। তা বলে, নেকেড ড্যান্স? ও আবার কী কথা। রাজেশ্বর ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "বলেছি বলে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ? এ রকম সাহস তো এ পাড়ায় কারোর আজ পর্যন্ত দেখিনি!" আমি বলেছিলাম, "তাড়িয়ে দেব কেন? আমি পারব না তাই বলেছি।"

'আমি জানতাম, কোন কোন মেয়ে লোকের মন রাখার জন্য, তা-ও করে। কী না করে। সেই যে বলে না, ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর? সেইরকম। যা চাও, যেমনটি চাও, সব পাবে। টাকা ছাড়। ছেলেবেলায় আমার বাবার মুখে একটা কথা শুনতাম, চাঁদির জুতো। এখন তার মানে বেশ ভাল বুঝি। আমাদের তা বলে কেউ চাঁদির জুতো মেরে যেতে পারে না। রীতিমত খেটে রোজগার করি। কিন্তু তা বলে, টাকা দিয়ে, যে যা খুশি করতে চাইবে, তা আমার দ্বারা হবে না। সত্যি, লোকের যে কত রকমের চাহিদা! এই একটা ব্যাপারে দেখছি, মানুষের ঘেন্নাপিত্তি বলে কিছু নেই। আমার জীবনের প্রথম বাবু, পীতুবাবু অনেক কিছু করেছেন। তখন থেকেই জানি, মানুষের ঘেন্নাপিত্তি বলতে কিছু নেই। তা বলে, সব মানুষ তো আর একরকম না। তখন বয়স অল্প ছিল। পীতুবাবাকে নিয়ে মনে একটা ভয় ছিল। পীতুবাবু বলে কথা। কিন্তু পীতুবাবু যা-ই করে থাকেন, আমি কি সে সব করেছি? মরে গেলেও পারব না। আজ পর্যন্ত পারিনি। তারপরে জানি না, কোনদিন পারব কিনা। জীবনে কোন কিছুই জোর করে বলা যায় না। আমি কি আগে জানতাম, পীতুবাবুর বাগানবাড়িতে আমাকে কেন নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তখন আমি যা

পেরেছিলাম, তা পারব বলে কি জানতাম। এ বয়সের মধ্যেই, হাজার গণ্ডা পুরুষ পার করে দিলাম। এসব যে পারব, আগে কখনো জানতাম? জীবনে কোন কিছুই আগে থেকে ঠিক করে বলা যায় না।

'আজ যা টাকা নিয়েও করতে পারি না, কাল হয়তো বিনা টাকাতেই তা করব। কিছু বলা যায় না। কিন্তু এখনো পারি না। তা বলে, এ ব্যবসা করতে গেলে যেসব ছলাকলা করতে হয়, তা কি আর জানি না? কথায় বলে, ছেনালি। ওইটি না জানলে এখানে এক দণ্ড থাকা চলে না। যে কাজের যেমন রীতি। শুধু মুখ দেখিয়ে কিছু হয় না। শরীর দেখিয়েও কিছু হয় না। অনেক ছলাকলা করতে হয়। শিখতে হয় না, আপনা থেকেই রপ্ত হয়ে যায়। ছলাকলা দুনিয়ায় সব ব্যবসাতেই করতে হয়। তা আবার মেয়েমানুষের গতরের ব্যবসা। ছলাকলা ছাড়া এক তিল চলে না। মেয়েদের এমনিতেই ছলাকলা ছাড়া চলে না, বেশ্যার তো কথাই নেই। কিন্তু কেউ এসে যা খুশি তাই বায়না করবে, তা মেটাতে পারব না। আমি পারব না। তা বলে অন্য মেয়ে কি পারবে না? কতরকমের মেয়ে আছে, কত কী করে। তার জন্যই রাজেশ্বরকে ওরকম বলেছিলাম। রাজেশ্বর খুব রেগে গেছল। সে আমার ঘর ছেড়ে যায়নি। নিজে উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমার হাত টেনে ধরে খাটে বসেছিল। বলেছিল, "তোমার ঘরে ঢুকেছি যখন, বেরিয়ে আমি যাব না।"

'আমি হেসে বলেছিলাম, "বেরিয়ে যাবেন কেন? বসুন, কী খাবেন বলুন, আনিয়ে দিচ্ছি।" তবু রাজেশ্বর আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল। সে আগেই মদ খেয়েছিল। তার চোখ লাল ছিল। বলেছিল, তুমি জিনিসটি তো ভালই দেখছি, এতদিন চোখে পড়েনি কেন জানি না। আমি বসব তোমার ঘরেই, নাচও হবে তোমার

ঘরেই। নেকেড ড্যান্স কে করে, কে আছে দেখ, ডাক তাকে। তুমি আমার কাছে বসে থাকবে।"

'আমার হাসি পেয়েছিল। লোকটা ক্ষ্যাপা আছে। আমি জানতাম, আমাদের বাড়িতেই দোতলায় একটি মেয়ে আছে, নাম গীতা, বেঁটে খাটো শক্ত চেহারা। মুখখানি মিষ্টি আছে। গীতা একেবারে ক্ষেপী। টাকা দিলে সে বাজনার তালে তালে উলঙ্গ হয়ে নাচতে পারে। ওকে কি নাচ বলে নাকি? শরীরের কতকগুলো অঙ্গভঙ্গি। আমি রাজেশ্বরকে বলেছিলাম, "ওরকম নাচ না দেখলে আনন্দ পান না, না?"

রাজেশ্বর বলেছিল, "লোকে কত খেলা দেখতে ভালবাসে। আমার এই খেলা দেখতে ভাল লাগে।" আমি হেসে উঠেছিলাম। এর নাম খেলা। তা একরকম খেলাই তো। এক এক সময় মনে হয়, আমরা সবাই খেলতে এসেছি। আমাদের কাছে যারা আসে, তারাও এক রকমের খেলা খেলতে আসে। আমরাও এক রকমের খেলা খেলছি। বলেছিলাম, "একটি মেয়ে আছে, আপনি যেরকম চান, সে সেরকম নাচে। আপনাকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেখানেই নাচ দেখবেন।"

'রাজেশ্বর আমাকে প্রায় বগলদাবা করে টেনে নিয়ে বলেছিল, "সেটি হবে না। তুমি নাচবে না বলেছ, ঠিক আছে। কিন্তু তুমি আমার পাশে বসে থাকবে, আমি নাচ দেখব। ডাক তোমার নাচনেওয়ালীকে। আমি যেন বড়ই অশান্তি আর লজ্জা পেয়েছি, এভাবে বলেছিলাম, "ছাড়ুন ছাড়ুন, আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে" রাজেশ্বর আমার গাল টিপে দিয়ে বলেছিল, "তুমি একেবারে কচি খুকি। জড়িয়ে ধরলেই দম বন্ধ হয়ে যায়।" আমি গালে হাত দিয়ে বলেছিলাম, "বাব্বা। আমার লাগে না বুঝি?" রাজেশ্বর বলেছিল, "লাগবে না কেন? চোট তো লাগেনি।" বলে যে চোখের ইশারায়

হেসেছিল। রাজেশ্বর পাজী আছে। আমি তার হাত ছাড়িয়ে উঠে দরজা খুলতেই, সে আবার বলে উঠেছিল, "দাঁড়াও, আগে একটু মালের ব্যবস্থা করা যাক। তোমার লোককে ডাক।"

'আমি আমার চাকর রামাবতারকে ডেকেছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কী খাবেন বলুন ?" রাজেশ্বর জিজ্ঞেস করেছিল, "তুমি কী খাবে ?" আমি মাথা নেড়ে বলেছিলাম, "আমি মদ খাই না।" রাজেশ্বর তার ওপর দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, "তুমি খাও না, শোঁক। ওসব ভড়কিবাজী আমি অনেক দেখেছি। তুমি মদ খাও না, ন্যাংটো হয়ে নাচতে পার না। ঘরের বউ নাকি, তুমি এক ছাড়া দুই জান না ?" তখন আমি একটু চোখ ঘুরিয়ে হেসে বলেছিলাম, "আমি আপনাকে নাচাতে পারি।" রাজেশ্বর বলেছিল, "বটে ? দেখব। তাহলে তোমার খুটোয় ভ্যাড়া হয়ে থাকব। এখন ন্যাকামিটি ছাড় তো চাঁদ, ওসব খাই না টাই না বললে আমি শুনছি না। কোনদিন না খেয়ে থাক, আজ খেতে হবে। এই নাও টাকা, কী খাবে বলে দাও, নিয়ে আসবে।" সে একশো টাকার একটা নোট আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

'ইচ্ছে করলে, গোঁ করে থাকতে পারতাম, খাব না। অনেককেই বলে দিই, খাব না। মদ তো রোজই খাই। না খেয়ে পারি না। কিন্তু প্রথম রাত্রি থেকেই মদ নিয়ে বসলে, পরে আর সামলানো যায় না। মদ খেলেই মেজাজ অন্যরকম হয়ে যায়। খদ্দের ফিরে যায়। ব্যবসা মাটি। মদ খেয়ে কারবার মাটি করতে রাজী না। জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কতক্ষণ থাকবেন ?"

'রাজেশ্বর ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল। বলেছিল, "যতক্ষণই থাকি, তোমার সারা রাত্রের টাকা পাবে।" এরকম কথা অনেক শুনেছি। বড় বড় কথা বলবার লোকের অভাব এখানে হয় না। আবার মৌনীবাবাও অনেক দেখেছি, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।

কিন্তু পাজীর পা ঝাড়া। কাজ মিটিয়ে, তারপরে আর টাকার হিসেবে মেলে না। তখন ঘড়ি আঙটি ধরে টানাটানি করতে হয়। অনেকের তাও থাকে না। সেরকম সন্দেহ হলে, আমরা আগেই টাকা নিয়ে নিই। এককথায় কারোকে আমি বিশ্বাস করি না, রাজেশ্বরকেও করিনি। বলেছিলাম, "আমার এক রাত্রের কত টাকা জানেন তো?"

রাজেশ্বর পকেট থেকে দুটো একশো টাকার নোট নিয়ে, খাটের বিছানায় ফেলে দিয়ে বলেছিল, "পাড়ায় এর থেকে বেশি কেউ নেয় বলে তো শুনিনি।" আমি হেসে বলেছিলাম, "প্রথম রাত্রি থেকে বসলে তা-ই। রাত্রি এগারোটার পরে এলে অর্ধেকেই হতো।" রাজেশ্বরের মেজাজ গরম হচ্ছিল। একটু হওয়া ভাল। ঠাণ্ডা করতে হয় কেমন করে, তা জানি। একটু গরম হওয়া ভাল। সে বলেছিল, "মেলা বকিও না তো। টাকাটা তুলে নিয়ে যাও। মাল খাবে, আনতে দাও।" জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনি কি খাবেন?" সে বলেছিল, তুমি যা খাবে, আমিও তাই খাব। তারপরে নাচনে-ওয়ালীকে ডাক।"

'আমি বুঝেছিলাম, মদটাই আগে দরকার। আমি রামাবতারকে মদ সোডা আর খাবার আনতে পাঠিয়ে, গীতাকে নিজেই ডাকতে গিয়েছিলাম। গীতা বসেছিল, এক কথাতেই রাজী হয়েছিল। আমি ওকে আগেই জিজ্ঞেস করে নিয়েছিলাম, কত নেবে। এটাই নিয়ম। আমার ঘরে, অন্য মেয়েকে ডেকে বসালে, তার সঙ্গে গল্প করলে, নাচ দেখলে, সে যা চাইবে, তা আমাকেই আমার বাবুকে বলতে হবে। টাকাটা নিজের হাতে নিয়ে দিতে হবে। সব ব্যবস্থার পরে আগে মদের পর্ব চলেছিল। রাজেশ্বর গীতাকে কাতুকুতু দিয়ে খুব হাসিয়েছিল। নাচবার আগেই, তার গা থেকে জামা কাপড় সব খুলে নিয়েছিল। গীতা প্রথমে আমার একটা তোয়ালে টেনে নিয়ে নিজেকে ঢেকেছিল। রাজেশ্বর একেবারে ক্ষ্যাপা। সে তোয়ালেটাও

টেনে নিয়েছিল। গীতা বেশ মাতাল হয়ে পড়েছিল। সে আর কোন চেষ্টা না করে, বসে বসে মদ খেয়েছিল। এক সময় আমি উঠে রেকর্ড চালিয়ে দিয়েছিলাম। গীতা মেঝের ওপর নাচতে আরম্ভ করেছিল। রাজেশ্বর মাঝে নানান কথা বলে গীতাকে আরো ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। আমার ঘরে সেরকম নাচ এই প্রথম। তারপর থেকে রাজেশ্বর এলে গীতার ডাক পড়ে। মাঝে মাঝে রাজেশ্বর তার বন্ধুবান্ধব নিয়েও আসে। এই তিন বছর ধরে, রাজেশ্বর মাসে অন্ততঃ চার দিন আসতই। কোন কোন মাসে তার বেশি। পরে শুনেছি, এ পাড়ায় তার অনেক দিনের যাতায়াত। রেণু নামে একটি মেয়ের ঘরে সে আগে প্রায়ই যেত। আমার কাছে আসার পরে আর কারোর ঘরে যেত না। যে কারণেই হোক, আমাকে রাজেশ্বরের ভাল লেগে গেছিল। রূপের জন্য ভাল লেগেছিল, তা বলি না। আমার থেকে অনেক সুন্দরী মেয়ে আমাদের বাড়িতেই আছে। সে বলত, আমার সঙ্গে কথা বলে তার ভাল লাগে। তিন বছরের মধ্যে, আমি তার সব জেনে নিয়েছিলাম। তার বাড়ি বউ ছেলে মেয়ে, জ্ঞাতি গোষ্ঠির সব কথা। তার কথা থেকে বুঝেছি, সে যে তার বউকে ভালবাসে না বলে এখানে আসে, তা না। তার বউ ভালমানুষ, গোবেচারা স্বভাবের। রাজেশ্বর ছাড়া সে কিছু জানে না। স্বামী মদ খায়, সে জানে। আমাদের কাছে আসে, তা স্পষ্ট করে জানে না। কিন্তু কখনো কিছু বলে না। রাজেশ্বর বলে, তার বউ যদি একটু মেজাজী হত, তা হলে ভাল হত। তার বেশ বড় ছেলে আছে, তাকে দেখে কোনদিন বুঝতে পারিনি। ছেলে কলেজে পড়ে। ছোট মেয়েটি নাকি তার সব থেকে আদরের। জ্ঞাতিরা তার পরম শত্রু। সব সময় ক্ষতি করবার চেষ্টা করে।

'আমি ভেবে দেখেছি, রাজেশ্বর আমার এখানে আসত একটু

খেয়াল খুশি মেটাতে। তার বউ মেজাজী না, সেটা তার দুঃখ। কিন্তু তার বড় ছেলেটির জন্য মনে দুঃখ। ছেলেটা নাকি অভদ্র চোয়াড়ে মতন হয়েছে, রাজেশ্বরের মুখে মুখে তর্ক করে। আর সেটাই তার জীবনের কাল হয়েছে। আজ কাগজে বেরিয়েছে, রাজেশ্বর রায় নিজের বন্দুক দিয়ে মাথায় গুলী করে আত্মহত্যা করেছে। সত্যি, খবরটা পড়ে এমন মনে হল, ওকে জুতো দিয়ে মারি। তুমি তোমার জীবনে এত বড় একটা ব্যবসা দাঁড় করিয়েছ, এত লোককে খাটাচ্ছ, তোমার এমন ভরা ভরতি সংসার, তুমি ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করে এমন জীবনটা নষ্ট করলে? প্রথমটা পড়ে ভারি কষ্ট হয়েছিল। এই নয় কি যে, রাজেশ্বরকে আমি ভালবেসেছিলাম। সে বড় প্রাণ মন খোলা লোক ছিল। সে আমার আলমারি ঘেঁটে বই দেখত। রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই নিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কবিতা পড়ত। আবার গীতার নাচ দেখত। কখনো কখনো নিজেও শিব হয়ে নাচতে আরম্ভ করত। সে আমার ঘরে উৎসব করত। তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেছল। এক একদিন সে মদ খেয়ে কেমন চুপচাপ থাকত। তখন আমাকে তার সংসারের কথা বলত। সে যদি ঝগড়া করে চলে যেত, আর কোনদিন আমার কাছে না আসত, তা হলে, কষ্ট পেতাম না। লোকটা বেশ্যাকেও কাঁদিয়ে গেল। দশজনের সামনে কাঁদতে পারিনি, তা হলে টিটকারীর জ্বালায় কান পাততে পারতাম না। খবরটা পড়ে কেন যে অমন কান্না পেয়েছিল, তা তো কারোকে বোঝাতে পারতাম না। সবাই অন্যরকম ভাবে নিত। তারা তো রাজেশ্বরকে চেনে না। খবরটা যখন গীতাকে বলেছিলাম, গীতা বলল, "যা শালা ন্যাংটো হয়ে একটু ধিত্তান তিত্তান করতাম, তাতেই বেশ হাতে মাল পেতাম। লোকটা নিজের হাতে গুলি খেয়ে মোল? আমার পোড়া কপাল।"

'গীতার কথাও ঠিক। কিন্তু আমি সেভাবে বলে, মন খালাস করতে পারি না। গীতা বলল, "ওর পোড়া কপাল।" সত্যি কি আমার বা গীতার পোড়া কপাল? না, পোড়াকপালটা আসলে রাজেশ্বরের। সে তার এই অল্প বয়সের জীবনে যা করেছিল, সব গিয়ে পড়বে কাঁচা বয়সের ছেলেটার হাতে। রাজেশ্বরের মুখে শুনেছিলাম, তবে ছেলের মাথা খাচ্ছে, তারই জ্ঞাতি গোষ্টিরা। একে বলে চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজানো। রাজেশ্বরের চামড়া দিয়ে জ্ঞাতিরা এবার ডুগডুগি বাজাবে। তার বৌ ছিল গোবেচারা, ভালমানুষ বউ। এখন সে হবে গোবেচারা ভালমানুষ মা। তার জীবনের তেমন হেরফের হবে না। কষ্ট হয়, রাজেশ্বর যা তৈরী করেছে, তা দু হাতে নষ্ট করা হবে।

'আমি ভেবেই বা কী করব। তবু ভাবনা হয়। প্রথম চোটটা কাটিয়ে ওঠার পরে, যতই রাজেশ্বরের কথা মনে হচ্ছে, এক একটা দিনের কথা মনে পড়ছে, ততই যেন আমার রাগ হচ্ছে। সে যে বলত, বিজলী তোমার চটি দিয়ে দু গালে মার, ইচ্ছে করছে, এখন তাই করি। আমার খাটে শুইয়ে তাকে জুতো পেটা করি। ছি ছি রাজেশ্বর, কী করলে বল তো? আমার আর কী। একটা বেশ্যা গেলে, দশটা বেশ্যা তুমি পেতে। কিন্তু এমন কথা শুনি নি, মনের কথা কারোকে বলেছ। বলেছিলে কেন? তাই তো আজ ভাবতে হচ্ছে। কে শালার রাজেশ্বর রায়, আমার তাতে কী যেত আসত। তুমি আমার পিরীতের জার ছিলে না। তোমাকে নিয়ে আমার প্রাণ কোনদিন হা হুতাশ করেনি। কিন্তু সেই যে হেসে কুদে নেচে গেয়ে, অন্যকে হাসিয়ে মজা করতে, মন খুশি কথা বলতে, মুখে এক মনে আর এক ছিলে না, তাতে তোমাকে ভাল লেগেছিল। ঘর সংসারের কথা যদি বলতে, তা হলে এত কথা মনে হত না।

'আমি জানতাম, রাজেশ্বরের প্রেম করা ধাতে ছিল না। সে

বলত, "ওসব সাত কাহন বাক্যি বলে পিরীত করা আমার আসে না। অত ধৈর্য আমার নেই।" ঠিক কথা বলত। যা সত্যি, তাই বলত। ন্যাকা ন্যাকা পুরুষ আমারও ভাল লাগে না। মেয়ে-ন্যাকড়া পুরুষ দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। রাজেশ্বরকে আমি আমার মনের কথা কখনো বলিনি। সে শুনতেও চায়নি। তবু সে আমার বন্ধু হয়ে গেছল।

'না রাজেশ্বর, সত্যি কি আর তোমাকে জুতোপেটা করতে পারি। ওটা আমার মনের কথা না। জুতো আমার গালে। তবু বড় রাগ হচ্ছে তোমার উপর, খুব রাগ হচ্ছে। ইচ্ছে করছে···।

রাজেশ্বর অধ্যায় এখানেই শেষ হয়েছে। খাতার লেখিকাকে কি কেউ ডেকেছিল? তার বন্ধ দরজায় কেউ করাঘাত করেছিল? নাকি তার খোলা দরজা ঘরে, হঠাৎ কেউ এসে পড়েছিল বলে, বাক্য আর শেষ না করেই, একটা অধ্যায়ের ইতি হয়ে গিয়েছিল?

আমার কিন্তু তা মনে হয় না। খাতার লেখিকা, বিজলী চৌধুরিকে আমি যতটুকু বুঝেছি, সেই হিসেবে আমার মনে হয়, সে হঠাৎ তার উদ্গত কান্না রোধ করতে পারেনি। 'ইচ্ছে করছে—' এই ইতি থেকে আমার এই সিদ্ধান্তেই আসতে ইচ্ছে করছে। রাজেশ্বরের গালে জুতো মারা যায় না, তার এত রাগ হয়েছিল যে, সে আর নিজের কান্না রোধ করতে পারেনি। আসলে রাগটা যে তার রাগ না, তার লেখা পড়লে একটি ছেলেমানুষও সে কথা বুঝতে পারবে। রাগটা আসলে তার তীব্র অভিমান! বন্ধুর প্রতি অভিমান, কেন যে তার জীবনটাকে এভাবে নষ্ট করলো।

নারী পুরুষের সম্পর্কের, যে তীব্র আবেগকে প্রেম বলা চলে, নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে তা ছিল না। সে কথা স্পষ্টতই উল্লিখিত

আছে। বিজলী কখনো তার মনের কথা রাজেশ্বরকে বলেনি, রাজেশ্বর শুনতে চায়নি। এক পক্ষের মনের কথায়, কখনো প্রেম হয় না। কিন্তু বিজলী নামক দেহোপজীবিনীর মনটি কেবল কোমল ছিল না, সংসারের পথে চলতে গিয়ে আমরা যে মঙ্গল চিন্তা বা বুদ্ধির কথা বলি, আমাদের তথাকথিত সংসারের বাইরে থেকেও, তার সে সব বোধ ছিল অনেক বেশি। কিন্তু আমার কথা থাক, আজ বিজলীর আলোর বৃত্তে ঘুরি। পাতা ওল্টালাম।

'দুর্গা আজ নার্সিং হোম থেকে ফিরল। খবর আগেই পেয়েছিলাম, ওর মেয়ে হয়েছে। আজ চোখে দেখলাম। বেশ সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটি হয়েছে। এ আর দেখতে হবে না, নির্ঘাৎ সেই গুজরাটি প্রীতমলালের মেয়ে। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। প্রীতমলাল পাক্কা দু বছর ধরে, দুর্গার সঙ্গে আছে। দুর্গাকে সে পুরোপুরি রাখেনি। প্রীতমলালকে দুর্গার হাফ বাবু বলা যায়। সে রোজ রাত্রি এগারোটা নাগাদ আসে। রাত ভোর থেকে, সকালবেলা চান করে, জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে যায়। দুর্গার সব দায়দায়িত্ব বলতে গেলে প্রীতমলালেরই। তবে, রাত্রি এগারটার আগে পর্যন্ত দুর্গার ব্যবসাতে সে আপত্তি করে না। লোকটি শান্তশিষ্ট, দুর্গা তার বিপরীত। দুর্গা মদ খেয়ে চেঁচাবে, খিস্তি খেউড় করবে, এমনকি এক একদিন প্রীতমলালকে ধরে মারেও। সেই বলে না, ছ্যাঁচো কোট মার লাথি, লজ্জা নাইকো বেড়াল জাতির, প্রীতমলালের সেই অবস্থা। বড়বাজারে তার ব্যবসা আছে। সারাদিন কাজকর্ম সেরে সে দুর্গার কাছে আসে। কিন্তু প্রীতমলালের চড়া গলা কেউ কোনদিন শুনতে পায়নি। দুর্গা মদ গিলে চেঁচিয়ে প্রীতমলালকে মেরে কতদিন বলেছে, "গুখেকোর ব্যাটা, কেন মরতে তুই আমার গায়ের চামটি হয়ে আছিস। বেরো, আমার ঘর থেকে বেরো। দূর হয়ে যা।"

'প্রীতমলাল বেড়াল না, মহাদেব। মার খেয়েও, হেসে, দুর্গাকে বুকের কাছে চেপে ধরে, তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে। দুর্গা শান্তও হয়, সবই ঠিক হয়ে যায়। তবে পেটে একটু বেশি মদ পড়লেই গোলমাল। গোলমালই বা কী। ওসব এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। ওটা একটা ধরন। তবে হ্যাঁ, ওসব ব্যাপারে কখনো অন্য কারোর নাক গলানো উচিৎ না। প্রীতমলালকে ধরে মারবার সময়, কেউ যদি কখনো থামাতে গেছে বা কিছু বলতে গেছে, তখন দুর্গার আর এক মূর্তি। বলে, "কেন লো মাগী পরভাতারী হারামজাদী। আমার ব্যাটাছেলেকে আমি যা খুশী তাই করব, তুই বলবার কে? তোকে কে সাউকারি করতে ডেকেছে? আমার লোককে আমি মেরেছি, তোর গায়ে লাগছে কেন? রঙ দেখাতে এসেছিস? ঘর ভাঙবি?"

'এসব শোনবার পরে, আর কেউ কখনো এগোয়নি। ও যে অমন ঠাস ঠাস করে, নির্ঘাত মারতে শুনলে, খুব খারাপ লাগে। ও আবার কেমন পিরীত বাবা? নিজের নাটুয়াকে না মারলে তোমার তুষ্টি হয় না? বলেই বা কী লাভ। প্রীতমলালের মুখে তো হাসি। আবার এর উল্‌টোও আছে। আরতিটাকে মাণিক মেরে পাট পাট করে। মনে হয়, কোনদিন মেরেই ফেলবে বুঝি। কিন্তু মাণিককে ছাড়া, আরতি কিছুই জানে না। হ্যাঁ যদি বুঝতাম, মাণিক তোমার রোজকার বাঁধা বাবু, তোমার দায়দায়িত্ব সব নিয়েছে, তাহলেও একটা কথা ছিল। তাও না। মাণিক হল সেইরকম, ভাত দেবার নাম নেই, কিল মারবার গোঁসাই। কিন্তু বললে কী হবে, রোগ তো অন্যখানে। আরতির মুখেও তো সেই এক কথা। তাকে মারছে তো কার বাপের কী? তাকে মেরে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আসবে, তাতে অন্যের গায়ে লাগে কেন। এসব শোনার পরে, সেখানে আর কে নাক গলাতে যাবে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার জন্য দায়

কেঁদেছে। তার চেয়ে, মেরে আর মার খেয়ে যদি শান্তিতে থাকে, তাই থাক। তবু খারাপ লাগে। আমার কখনো এরকম হয়নি।

'আজ দুর্গা যখন মেয়েটাকে বুকে নিয়ে ফিরে এল, মনটা কেমন ভার হয়ে গেল। আমার ছেলেটার কথা মনে পড়ে গেল। বেঁচে থাকলে এখন পাঁচ বছরের হত। তা না, কুকুরছানা নাড়ানাড়ি করে মরলাম। ছেলেটাকে আমার পেটে কে দিয়েছিল জানি। সে কথা তাকে আমি কখনো বলতে পারিনি। বলে কোন লাভ ছিল না। বিশ্বাস করত না, হয়তো অন্য কিছু ভাবতো। মা আমাকে বারবার পেট খসাবার জন্য বলেছিল। আমি শুনিনি। আমি কলকাতায় আসার পর থেকেই, একজন নিয়মিত আমার কাছে আসত! প্রায় রাত্রেই সে আমার কাছে আসত। সেই লোকটিকে আমার মা-ও বিশ্বাস করেছিল। তাই তার সঙ্গে আমাকে দুবার বাইরেও বেড়াতে যেতে দিয়েছে। একবার নিয়ে গেছল নৈনিতাল, আর একবার দার্জিলিং। দিব্যি তার বউ হয়ে বেড়িয়েছি। সতি কথা বলতে কি, মনে হত, সত্যি সত্যি যদি সে আমাকে বিয়ে করে ঘরের বউ করে নিয়ে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ায়?

'আসলে আমি তার বউ ছিলাম না বলেই, সে আমাকে নিয়ে বেড়িয়েছিল। তার নিজের বৌ হয়তো জীবনে কোনদিন নৈনিতাল, দার্জিলিং চোখেও দেখেনি। একটা চুক্তি সকলের সঙ্গেই থাকে। বউ-এর সঙ্গেও থাকে, বেশ্যার সঙ্গেও থাকে। দুটো দুরকমের চুক্তি। বউ আর বেশ্যাতে তফাত আছে। বউ যা পছন্দ করে না, তা করতে চাইলে অনর্থ হয়। বেশ্যারও পছন্দ অপছন্দ আছে। তবু বেশ্যা বলতে মানুষ অন্য কিছু বোঝে। তার কাছ থেকে সে অনেক কিছু আদায় করে নিতে চায়, নেয়ও। বেশ্যা যা কিছু দেয় টাকার দাবীতে। বউয়ের দাবী অনেক রকম। সেখানে বাঁধাবাঁধি থাকে। বেশ্যার সঙ্গে কোন বাঁধাবাঁধি নেই। হবে না? দেব না? তাহলে

চললাম। বউকে একথা বলা যায় না। পুরুষের কাছে, বউ পুরোটা সুখের না। পুরুষ ভাবে, বেশ্যা হল পুরোটাই সুখের। আমরা হলাম, পুরুষের কাছে খাবলা মারা সুখ। জীবনের নানান ধাক্কা, সংসার বউ ইত্যাদি নিয়ে চলতে চলতে, হাত বাড়িয়ে এক খাবলা সুখ ভোগ করে নেওয়া।

'দুঃখের কি আছে। সেইজন্যই তো আছি। তুমি খাবলা মেরে সুখ নেবে, আমি খাবলা মেরে টাকা নেব। তবু তখন অবনীকে নিয়ে মনে মনে অনেক কিছু মনগড়া ভাবনা ভেবেছি। সে একটা বড় চাকরি করত, এখনো নিশ্চয়ই করে, কিন্তু সে আর আসে না। তার চাকরিটা হলো, আঁকাজোকার চাকরি। অনেকদিন সে আমার ঘরে বসে, কাগজ পেন্সিল বোলালেই ছবি। আগে কখনো এরকম দেখিনি। দেখে এত ভাল লাগত, অবনীর গায়ের কাছে ঠেস দিয়ে, গালে হাত দিয়ে, অবাক হয়ে তার আঁকা দেখতাম। সে কয়েকবার আমার ছবিও এঁকেছে। কিন্তু মুখটা কখনো ঠিক আঁকতে পারেনি। চোখ মুখ নিয়ে সে কী একটা গোলমাল করে ফেলত। আমার মুখ বলে মনে হত না। দুবার সে আমার গায়ের সব জামা কাপড় খুলে নিয়ে ছবি এঁকেছে। প্রথমে আমি আপত্তি করেছিলাম। ও আবার কী কথা! ল্যাংটো করে ছবি আঁকবে? তারপর সে অনেকবার অনুনয় বিনয় করতে, রাজী হয়েছিলাম। দেখেছি, ছবি আঁকবার সময় সে অন্য মানুষ। আমি যে একটা মেয়েমানুষ, তার সঙ্গে শুই, সে কথা যেন তখন তার মনে থাকত না। সে চোখ কুঁচকে, ঘাড় বেঁকিয়ে, দূরে গিয়ে, কাছে এসে, এমনভাবে আমাকে দেখত, যেন আমি একটা অন্য বস্তু। তাতে আমারও লজ্জাটা কেটে যেতো। কিন্তু আমার সে সব ছবি একটাও আমাকে দেয়নি। অবনী নিয়ে গেছে। আমার উলঙ্গ ছবি এঁকে, সে আমাকে আলাদা করে টাকা দিত। খুশিই হতাম। পরে শুনেছি, সেই ছবি দিয়ে অবনী ব্যবসা

করছে। অবনীর বন্ধুর মুখেই শুনেছি। টাকা কি আর এমনি কেউ দেয়? অবনী বলত, "বিজলী, যে কোন আর্টিষ্ট তোমার শরীরের দিকে তাকালে, ছবি আঁকতে চাইবে। আর্টিষ্ট যা যা চায় সব তোমার শরীরে আছে।"

'সে অনেক কথা বলত, আমি সব কথার মানে বুঝতাম না। আমার পেটে বাচ্চা এসেছে শুনে, অবনীর ভাল লাগেনি। সে আসা কমিয়ে দিয়েছিল। পেট একটু বড় হতে, সে আসা বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর যখন ছেলে হল, সে আবার এসেছিল। আমি তাকে বলতে পারতাম, আমার পেটের ছেলেটি তারই দেওয়া। পাছে সে ভাবে, আমি তার জন্য কিছু চেয়ে বসব, সেই জন্য বলিনি। আমি ভেবেছিলাম, ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে অবনী নিজেই বুঝতে পারবে কার ছেলে। জানি না সে কোনদিন বুঝেছিল কিনা। মুখে কিছু বলেনি। ছেলে হবার পরে কয়েকবার এসেছিল, তারপরে একেবারেই আসা বন্ধ করে দিয়েছিল।

'আমি যে অবনীকে ভালবেসেছিলাম বলে পেট খসাতে চাইনি, তা না। বাচ্চা যারই হোক, আমার পেটে যখন এসেছে, তাকে আমি ছাড়তে পারিনি। মনটা মানেনি। যাকে কখনও চোখে দেখিনি, তার জন্যই মনটা কেমন টনটনিয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, যে এসেছে তাকে পেট থেকে বের করে আমি দেখব। কোলে নেব। সে এক বড় সুখের চিন্তা ছিল। ছেলেটা হবার পরে, মায়ের মনটাও গলেছিল। কিন্তু কী এক সর্দিকাশি নিয়ে যে ছেলেটা জন্মেছিল, তাতেই বুকে কফ জমে ছেলেটা মারা গেল। মুখে বলি, গেছে, আপদ গেছে। কিন্তু মনে মনে তো জানি, পোড়ানি কোথায়। ছেলেমেয়ে চায় না, এমন বেশ্যাও কম আছে! দীপালির সাত বছরের ছেলে আছে, তাকে সে বাইরে রেখে পড়ায়। শুনেছি, মিশনারীদের ইস্কুলে পড়ে। ছেলেকে সে মাঝে মাঝে দেখতে যায়। আমারটা

থাককলে আমিও তাকে পড়াতাম। ছেলেবেলায় একটা ভাইয়ের জন্য মাকে কত বলেছি। তখন কি ছাই জানতাম, ইচ্ছে করলেই মা ভাই দিতে পারে না।

'ওই তো শুনতে পাচ্ছি, দুর্গার মেয়েটা ট্যাঁ ট্যাঁ করছে। আমার ছেলের গলার স্বরটা ছিল মোটা। তার বুকের জোর কম ছিল, সে চেঁচিয়ে কাঁদতে পারত না। না, আর এই ট্যাঁ ট্যাঁ শুনতে পারি না। যাই, দুর্গার মেয়েকে একটু কোলে করি গে।'

বিজলীর ছেলের অধ্যায় এখানেই শেষ। বেশ বোঝা যায়, তার মাতৃহৃদয়ে স্মৃতি, ব্যথা, স্নেহ উথলে উঠেছিল। দুর্গার মেয়েকে বুকে নিয়ে, সে একটু নিজেকে ভোলাতে গিয়েছিল। খাতার পাতা যতই উল্টোই, নানান ঘটনা নানা চরিত্রের সমাবেশ। তার জীবনের সব থেকে বড় ঘটনা যেটা, যা তার জীবনকে অন্য দিকে ক্রমাগত ঠেলে নিয়ে গিয়েছে, সেটা আমি খুলে ধরছি।

'এখন বুঝতে পারি, বেশ্যাই হই আর যাই হই, সংসারে সব মেয়েরই চিন্তা ভাবনা বোধ হয় একরকমেরই। কিন্তু বেশ্যাদের একেবারে বেশ্যা হওয়াই ভাল। তার মধ্যে আর আন্ থাকা উচিত না। থাকলেই গোলমাল। কথায় বলে, চালুনি বলে ছুঁচকে, তোর গুহ্যে কেন ছেঁদা। অন্য কত মেয়েকে নিয়ে কত কথা বলেছি, কত ভিকনেশি কেটেছি। শরতবাবুর সেকালের ছবি দেবদাস দেখতে গিয়ে চন্দ্রমুখীকে যেমন মনে হয়েছে তার মরণদশা ধরেছে, একালেও অনেক বেশ্যার সেই মরণদশা দেখে অনেক কথা বলেছি।

'সমাজ সংসারের লোক আমাদের থেকে অনেক বুদ্ধিমান। তারা সব কিছু ভেবে চিন্তে, বেশ গুছিয়ে চলতে শেখে। আর বেশ্যাবৃত্তি করতে এসে, আমাদের মনে নানান জট পাকায়। এই নয় কি যে,

আমাদের বাইরের সংসারের দিকে তাকিয়ে, মনে কোন কষ্ট বা হা-হুতাশ করি। কিন্তু মনে আমার খাজনা খাজনা, কে করবে আমার হরিভজনা। মুখে যাই বলি, মনে মনে মরবার বড় ইচ্ছে। কয়েকবার মরতে মরতে বেঁচে গেছি। মরি তো নির্ঘাত মরব। মরবার জন্য একজন শ্যাম তো চাই। যোদো মোধোর জন্য মরব কেন ? তা ছাড়া, মন না মরতে চাইলে মরি কেমন করে। মন মরে, তাই মরতে হয়। শ্যামের জন্য যে মরেছে, সেই জানে মরা কী। বুঝতে পারিনি, শ্যামের জন্য মরা কাকে বলে। তাদের পায়ে শত কোটি প্রণাম। যারা বলেছে, শ্যাম রাখি না কুল রাখি। শ্যামের জন্য শুধু মরাই যায়, আর কিছু না। তার জন্য সবই ছাড়তে হয়। ধন বল, গর্ব বল আর কুলই বল, সব ছাড়তে হয়।

'কথাটা বলি। কথা নাকি ? মরণের কথাটা বলি। অতসী এক তলার এক ঘরে থাকে। ওর ঘরে প্রায় সন্ধ্যাতেই এক ভদ্রলোক বহুদিন ধরে আসেন। একেবারে ফুলবাবু। কোঁচার পত্তন দেখলে বোঝা যায়, বনেদীয়ানা কাকে বলে। টকটকে ফরসা রঙ। গায়ে বিলিতি সেন্টের গন্ধ। বিলিতি মদ ছাড়া খান না। কলকাতার এক নামকরা পরিবারের ছেলে, বয়স চল্লিশ হবে। শুধু নামকরা বললে হয় না, এক ডাকে মনে পড়ে, এমন পরিবারের সন্তান। কিন্তু আমার যেন ভদ্রলোককে কেমন মাকাল ফল বলে মনে হত। অতসী নিজে আমাকে অনেকবার ডেকেছে। ওর বাবুর সঙ্গে, ওর ঘরে গিয়ে বসবার জন্য। আমি গেছি, হাত তুলে নমস্কার করেছি, কিন্তু কখনো বসিনি। ভদ্রলোকের নাম ত্রিভুবনরমণ। সবাই রমণবাবু বলে। রমণবাবু অনেকবার বলেছেন, "একটু বস না, তাতে তো জাত যাবে না।"

'আমি বলেছি, "জাতে কী কথা আছে। আমাদের কাছে সব জাতই সমান। আজ বসব না, আর একদিন বসব।" এইরকম বলে

চলে আসতাম। রমণবাবু বলেন, "বসে এক পাত্তর খেয়ে যাও না, তাতে তো আর অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।" রমণবাবু একটু ফাজিল মতন আছেন। ভারি মুখফোড়। মুখে কোন কথা আটকায় না। মাঝে মাঝে সেরকম কথাও বলেন। আমি হেসে পালিয়ে এসেছি। এমন হয়েছে, সন্ধ্যেবেলা ঘরে একলা বসে আছি, পর্দাটা ফেলা আছে। রমণবাবু হঠাৎ পর্দা সরিয়ে বলেছেন, "আসতে পারি?" আমি বলেছি "আসুন।" তারপরে উনি বলেছেন, "বসতে পারি? আমি মাথা নেড়ে বলেছি, "না দাদা।"

'রমণবাবুকে আমি প্রায়ই দাদা বলতাম। তা ছাড়া, আমাদের একটা নিয়ম আছে। নিজেদের জানাশোনার মধ্যে, কারোর লোককে আমরা নিজের ঘরে বসাই না। সেজন্য দাদা পাতিয়ে নিই। মরে গেলেও তাকে নিজের ঘরে বসাতে পারব না। রমণবাবুর ধারণা আমার খুব অহংকার, ভারি দেমাক। আমি হাসি, তা বললে আর কী হবে। আমার ঘরে ঢুকলে তিনি প্রায়ই আমার বইয়ের দিকে দেখতেন। জিজ্ঞেস করতেন, "কার বই তুমি সব থেকে ভালবাস? বলতাম, "অনেকের। রবিঠাকুর থেকে ত্রিদিবেশ রায়।" উনি বলতেন, "ত্রিদিবেশের বইও তুমি পড়? ওর সঙ্গে আমার খুব পরিচয় আছে।" আমি বলতাম, "ত্রিদিবেশবাবু আমার প্রিয় লেখক।" উনি বলতেন, "বুঝেছি, ত্রিদিবেশকে বলতে হবে।" আমি বলতাম, "শুনে ত্রিদিবেশবাবু দুঃখ পাবেন। এ পাড়ার একজন মেয়ে তাঁর বই পড়ছে, শুনলে রেগেই যাবেন। রমণবাবু বলতেন, "না, যাবে না।"

'আমি চুপ করে থাকতাম। ত্রিদিবেশ রায়ের মুখটি আমার সামনে ভেসে উঠত। আমি তাঁকে চিনি। আমার এই জীবনের আগে চিনতাম। উনি আমাকে চেনেন না, চেনবার কথাও না। উনি আমাদের সেই ছোট শহরের লোক। আমাদের পাড়ার কাছাকাছিই থাকতেন। তখন লেখক হিসেবে নাম ডাক ছিল।

চাকরি করতেন। আমার থেকে বারো চোদ্দ বছরের বড় হবেন। অল্পবয়সে বিয়ে করেছিলেন। দু'তিনটি ছেলেমেয়েও দেখেছিলাম। ক্লাস ফোরে পড়ার সময়, একটি মেয়েই আমাকে তাঁকে দেখিয়ে বলেছিল, "এই ত্রিদিবেশদা। উনি গল্প লেখেন।" লোকটিকে চিনতাম, নামে চিনতাম না। গল্প লেখার কথাও জানতাম না। চেহারাটি দেখে ভাল লেগেছিল। বিয়ে করেছেন, ছেলেপিলে আছে, মনেই হয়নি। বেন্দাদের থেকে বেশি বয়স মনে হয়নি। পরে তার বউয়ের নাম শুনেছি, দূর্বা রায়, শহরের সভা সমিতিতে যেতেন। মেয়ে আমাদের থেকে ছোট, নাম রুণকি।

'আমি বই কিনি, বই পড়ি। ত্রিদিবেশবাবুর বই পড়তে খুব ভালবাসি। বোধ হয় তাঁকে ছেলেবেলায় দেখেছি বলে; বা আমাদের শহরের লোক বলে। কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটা বইই এত ভাল লাগে কেন? সেটাও কি তাঁকে চিনি বলে? তা হতে পারে না। আসলে তিনি গুণী লেখক। আমি যে তাঁর সব লেখা বুঝি, তা বলি না, তবে অনেক বই পড়েছি, অনেক কথা জেনেছি, খুব ভাল লাগে। উনি জীবনে অনেক দেখেছেন।

'তারপর থেকে, রমণবাবু আমার হাতে বই দেখলেই জিজ্ঞেস করেন, 'কী, ত্রিদিবেশ রায়ের বই পড়া হচ্ছে? একদিন কথায় কথায়, হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলাম, "ত্রিদিবেশবাবু এখন কলকাতায় থাকেন, না যেখানে বাড়ি সেখানেই থাকেন? রমণবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এত কথা আবার তুমি জানলে কী করে?" তোমার ঘরে এসেছিল নাকি কোনদিন?"

আমি জিভ কেটে বলেছিলাম, "ছি ছি, তা কেন। উনি এসব জায়গায় আসতেই বা যাবেন কেন?" রমণবাবু বলেছিলেন, "ওসব সাহিত্যিকদের কথা কেউ বলতে পারে না বাপু। আমরা বলি, মেয়েদের মন বোঝা যায় না। সাহিত্যিকেরা ভাবে গড়া। ব্যাটাদের

মনের হদিস পাওয়াই ভার। হয়তো কোন লেখার মতলব নিয়ে চলে এল এ-পাড়ায়।"

'হয়তো কথাটা একেবারে মিথ্যে না। ত্রিদিবেশ রায়ের কোন কোন গল্পে, আমাদের জীবনের কথাও আছে। সে সব মফস্বলের মেয়েদের নিয়ে লেখা। পড়ে মনে মনে খুব অবাক হয়েছি, কী করে এসব জানলেন। আমি রমণবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "বললেন না তো, উনি কি আগের জায়গাতেই আছেন, না কলকাতায় আছেন।" রমণবাবু বলেছিলেন, "ওর কোন ঠিক নেই। ও সবখানেই আছে।" আমি হেসে বলেছিলাম, "সে আবার কী, সে তো একমাত্র ভগবানই থাকতে পারে।" রমণবাবু বলেছিলেন, "সে ব্যাটাও ভগবান। কিছুতেই তার পাত্তা পাওয়া যায় না।"

'আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছল, আপনি দুর্বা রায়কে চেনেন?" রমণবাবু অবাক হয়ে বলেছিলেন, "সে কি, তুমি ত্রিদিবেশের স্ত্রীর নামও জান দেখছি! আর কী জান?" আমি হেসে বলেছিলাম, "তাঁর মেয়ের নাম রুণকি।" রমণবাবু এমন ভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন, যেন আমার বুকটা ভেদ করবেন, চোখ ফুটো করে দেবেন। বলেছিলেন, "এর পরেও বলছ, ত্রিদিবেশ তোমার কাছে আসেনি?" আমি বলেছিলাম, "না এলে বুঝি এসব জানা যায় না? তাঁর বিষয়ে কাগজেই তো কত বিষয় লেখা হয়।" রমণবাবু আমার কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারেননি। বলেছিলেন, "দাঁড়াও, ব্যাটাকে ধরতে হবে।" আমি খুব হেসেছিলাম। রমণবাবু কি তাঁর বন্ধুকেও চেনেন না? কী করে ভাবছিলেন, ত্রিদিবেশ রায় আমার কাছে এসেছেন? এলে, রমণবাবুর মতন যোগ্য সাথীর সঙ্গেই আসতেন।

'আমার ঘাড়ে শয়তান চাপল অন্য একদিন। রমণবাবু ত্রিদিবেশবাবুর কথা বলেছিলেন। তিনি ত্রিদিবেশবাবুকে আমার কথা বলেছিলেন, ত্রিদিবেশবাবু নাকি আকাশ থেকে পড়েছিলেন। আমি বলে

ফেলেছিলাম, "ত্রিদিবেশবাবুকে এখানে একদিন আনতে পারেন?" রমণবাবু বলেছিলেন, "পারলে?" আমি হেসে বলেছিলাম, পারলে আর কী হবে। আপনাকে এক পেট খাইয়ে দেব।" উনি বলেছিলেন, "তা আমি চাই না। ত্রিদিবেশকে আনতে পারলে, তোমাকে আমাদের সঙ্গে বসতে হবে।" আমি অবিশ্বাস করে বলেছিলাম, "ন'মণ ঘিও পুড়েছে, রাধাও নেচেছে। ওঁকে আপনি এখানে আনতে পারবেন না।" রমণবাবু বলেছিলেন, "সেটা আমি দেখব। তুমি তোমার কথা রাখবে তো?" আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ত্রিদিবেশবাবু কি মদ খান?" রমণবাবু বলেছিলেন, "তা মাঝে মধ্যে আমরা একসঙ্গে বসে থাকি। একদিন সন্ধ্যেয় না হয়, এখানেই বসা যাবে।" আমি ঠোঁট উলটে বলেছিলাম, "চেষ্টা করে দেখুন।"

'অন্ততঃ ছ মাসের মধ্যে রমণবাবু কিছুই করতে পারেননি। আমার সঙ্গে দেখা হলেই জিজ্ঞেস করতাম, "কী দাদা, আপনার চেষ্টা চলছে।" রমণবাবু বলতেন, "চলছে চলবে। সাহিত্যিক তো, পাঁকাল মাছ। ব্যাটাকে ধরতে পারছি না।" আমি হাসতাম। মনে মনে বলতাম, কোনদিন পারবেন না। আমি মনে মনে বোধহয় খুশিও হতাম। ত্রিদিবেশ রায় কখনো এইসব রমণবাবুদের মতন মানুষ না। তিনি কখনো এখানে আসতে পারেন না।

'তারপরে, আজ থেকে কতদিন আগে হবে, সেই দিনটি। এক বছর ছ মাস আগে। সন্ধ্যেবেলায় গা ধুয়ে সাজগোজ করে ভাবছিলাম, গা হাত পা কেমন ঝিম ঝিম করছে, একটু জিন খাই। এমন সময় অতসী এল। পর্দা সরিয়ে বলল, "বিজলী, তোর দাদা একবার ডাকছে। আমি অতসীকে বললাম, "আমার ভাল লাগছে না। তুই গিয়ে বল, আমার শরীরটা ভাল না। দেখিস রাগ না করেন এমনিতেই আমাকে অহংকারি বলেন। অতসী বলল, "তোকে যেতেই হবে, কী নাকি একটা বিশেষ কথা আছে।" আমি বুঝলাম, "কথা

আর কী, ত্রিদিবেশ রায়ের কথা বলবেন। ভাবলাম, পরে এসে জিন খাব। বললাম, "চল।"

'অতসীর সঙ্গে ওর ঘরের দরজায় গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। দেখলাম, রমণবাবু আর একজন কে ভদ্রলোক, আর ত্রিদিবেশ রায় বসে আছেন। তিনি আমার দিকে দেখলেন, রমণবাবুকে দেখলেন, আবার আমাকে দেখলেন। মুখে একটু হাসি। কিন্তু আশ্চর্য, চেহারাটা আগের থেকে ভাল হয়েছে, বয়স কি একটুও বাড়েনি ? সত্যি কি উনি এখানে এলেন ? মনে হল, তাঁর আসাটা আমাকে হারিয়ে দিল ? কেন এসেছেন ? রমণবাবুকে জিতিয়ে দেবার জন্য ?

'রমণবাবু জোরে হেসে বলে উঠলেন, লাগ্ ভেলকি লাগ্। কে দেখবে, জাদুর খেলা দেখে যাও। সকলেই হেসে উঠল। আমি চমকে গিয়ে তাড়াতাড়ি ত্রিদিবেশবাবুর দিকে তাকিয়ে হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করে বললাম, "নমস্কার।" ত্রিদিবেশবাবুও তাড়াতাড়ি হাত তুলে অতি বিনীতভাবে নমস্কার করে বললেন, "নমস্কার। আমার নাম ত্রিদিবেশ রায়।" রমণবাবু বলে উঠলেন, "এর নাম বিজলী চৌধুরী।" ত্রিদিবেশবাবু বললেন, "রমণদার মুখে আপনার নাম শুনেছি। রমণবাবু বলে উঠলেন, "সত্যি করে বল দেখি, কেবল নামই শুনেছ, নাকি আগে চোখেও দেখেছ।' ত্রিদিবেশবাবু হেসে বললেন, "ওকেই জিজ্ঞেস করুন, আমাকে কেন ?"

'আমি বললাম, "আপনি তো জানেন দাদা, আমি মিথ্যে কথা বলি না।" রমণবাবু বলে উঠলেন, "বেশ বেশ, মেনে নিলাম। এখন আমার বাজীটা মেটাও দেখি সখী। এসে চট করে বসে পড়।" বিলিতি মদের বোতল, সোডা, গেলাস, আগেই ট্রেতে সাজানো ছিল। রমণবাবু আবার বললেন, "আজ তুমিই আমাদের দেবে, আমি দেব তোমাকে।"

'জানি, আজ আর আমার উপায় নেই। আমি 'আসছি' বলেই

তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ছুটে গেলাম, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বুকের মধ্যে কেমন ধকধক করছে। মনে হচ্ছে, মাথার ঠিক নেই। কোন মানুষকে দেখে এরকম আর হয়নি। আমি নিজের দিকে ভাল করে দেখলাম। আমার সেই ঝিমঝিমানি ভাব হঠাৎ কোথায় গেল। নিজেকে যেন কিছুতেই আমার মনের মতন দেখছি না। অথচ আমি মোটেই বেশি রঙ চঙ মেখে সাজতে পারি না। রমণবাবুর ব্যস্ত গলা শোনা গেল, "কী হল গো বিজলী, দেরি কেন?" উনি দরজায় এসে পড়েছেন। রামাবতার বাইরে দাঁড়িয়েছিল। আমি ঘরের বাইরে গিয়ে বললাম, "চলুন।" রামাবতারকে বললাম, "কেউ এলে বলো, আমি ব্যস্ত আছি।" তারপরে আবার অতসীর ঘরে গেলাম। ত্রিদিবেশবাবু অন্য লোকটির সঙ্গে কী কথা বলছিলেন। মদের বোতল তখনো খোলা হয়নি। ত্রিদিবেশবাবু উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, "আসুন, বসুন।" শুনে যেন আমার গায়ে কাঁটা দিল। আসুন বসুন কাকে বলছেন? অবশ্য উনি তো আমাকে চেনেন না। আমি লজ্জায় কিছু বলতে পারলাম না। রমণবাবু বললেন, "ত্রিদিবেশ তুমি বস, বিজলীকে আমি বসাচ্ছি।" আমি তাড়াতাড়ি গদীর ওপরে ত্রিদিবেশবাবুর মুখোমুখি বসে পড়ে বললাম, "বসেছি। আপনি বসুন।" সবাই বসলেন। আমিই সকলের গেলাসে মদ ঢেলে দিলাম। রমণবাবু আমার গেলাসে ঢেলে দিলেন, তারপরে সবাই একসঙ্গে যখন গেলাস তোলা হল, রমণবাবু বললেন, "কী গো বিজলী সুন্দরী আমার চেষ্টা ফলল? আমিও হেসে বললাম, "তা না হলে এখানে বসেছি কেন দাদা?"

'হাসি গল্প মদ, সব একসঙ্গে চলতে লাগল। গলার স্বর রমণবাবুরই বেশী। ত্রিদিবেশবাবু প্রায় কথাই বলছিলেন না, বারে বারে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। মদ বড় পাজী জিনিস। বাতাস যেমন গায়ের কাপড় উড়িয়ে নেয়, মদ তেমনি মনের কথা মু

টেনে আনে। আমি ত্রিদিবেশবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, "এখানে আর কখনো এসেছেন ?" উনি হেসে বললেন, "এসেছি। আমার এক সম্পাদক বন্ধুর সঙ্গে, একদিন তার বান্ধবীর বাড়ীতে। কিন্তু কোন বাড়ি, তা বলতে পারব না।" আমি মনে মনে ভাবলাম, শুধু এসেছিলে, নাকি আরো কিছু ? সে কথা জিজ্ঞেস করা যায় না। তিনি আমাকে পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি আমার স্ত্রী কন্যার নাম জানলেন কী করে ?" আমি বড় লজ্জা পেয়ে গেলাম। রমণবাবু সব কথাই বলে দিয়েছেন। সত্যি কথাটা বলতে পারলাম না। বললাম, "আপনার স্ত্রী কন্যার নাম জানাটা কি খুব আশ্চর্যের ? ত্রিদিবেশ রায় বলে কথা ?"

'ত্রিদিবেশবাবু একটু ভাবলেন, হাসলেন, তারপর বললেন, "তা হবে। কিন্তু রমণদা যে ভাবে বলেছিলেন, তাতে মনে হয়েছিল, আপনি আমাদের পরিবারকে চেনেন।" আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "না না, তা কি করে সম্ভব।" তারপরে ওঁর গল্প উপন্যাস নিয়ে অনেক কথা বললাম। রমণবাবু বলে উঠলেন, "এ মেয়ে যে একেবারে সরস্বতী, সব মুখস্থ করে রেখেছে।" ত্রিদিবেশবাবু যেন অবাক, তবু মুখে খুশির হাসি। জানি না, তিনি আমার সম্পর্কে কী ভাবছিলেন। একসময়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এখানে এসে আপনার কী মনে হচ্ছে ?" তিনি বললেন, "ভালই তো, মন্দ কী।"

যেন ঠিক মনের মতন না। তবু বলতে হয়, বললেন। কিন্তু তারপরেই উনি বললেন, "আপনাকে বেশ ভাল লাগল। রমণবাবু চিৎকার করে উঠলেন, "পেলে লেগে যা।" সবাই হেসে উঠল। আমি ত্রিদিবেশবাবুকে বললাম, আমাকে আপনি করে বলবেন না।" উনি হেসে বললেন, "চেষ্টা করা যাবে।" কিন্তু চেষ্টায় লাভ হল না। আমাকে তুমি করে বলতে পারলেন না। রাত্রি এগারোটা বেজে গেল। সকলেরই ওঠবার সময় হল। কিন্তু একটা ব্যাপার

লক্ষ্য করেছি, যতবার চোখ তুলেছি, দেখেছি, ত্রিদিবেশবাবু আমাকে দেখছেন। জানি না, মনের ভুলও হতে পারে। একসময়ে একটু সুযোগ পেয়ে বললাম, "একদিন নিমন্ত্রণ করলে আসবেন?" উনি সহজ ভাবেই বললেন, "আসতে পারি।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কবে?" উনি বললেন, "বলুন কবে আসব?" আমি বললাম, "আপনার যেদিন খুশি। তবে আমাকে এখনই জানিয়ে রাখলে ভাল হয়। আমাদের ব্যাপার বোঝেন তো—।" উনি আমার কথা শেষ হবার আগেই বললেন "আগামী শুক্রবার সন্ধ্যেয় আসব।" আমার মনে শুক্রবার সন্ধ্যে গাঁথা হয়ে গেল।

'ত্রিদিবেশ রায় সকলের সঙ্গে চলে গেলেন। রাত্রি এগারোটা বেজে গেলেও, তখনো আমার কাছে লোক এল। কিন্তু আমি বসাতে পারলাম না! কিছুতেই আর ভাল লাগল না। দরজা বন্ধ করে দিয়ে আরো মদ খেতে লাগলাম। আমার কিসের মরণ ধরেছে, কে জানে। কেবল মনে হতে লাগল, এ জীবনটা আর কাটাতে পারছি না। এই এক ঘেয়ে জীবন। টাকা করেছি, মফঃস্বলে আমাদের শহরে একটা বাড়ি কিনেছি। কলকাতায় বাড়ী কেনবার মত টাকাও জমেছে। গহনাগাটিও মোটামুটি করেছি। আর ভাল লাগে না। রাগ হতে লাগল, কষ্ট হতে লাগল। কেবলই মনে হতে লাগল, কেন আর এ ভাবে জীবন কাটাব' আর কতকাল? ছুটি চাই, আমার ছুটি চাই।

সেই শুক্রবার এল। কটা দিন এই শুক্রবারের মুখ চেয়ে *কাটিয়েছি। নিজেকে নিয়ে যে কী করব, তা যেন ঠিক করতে* পারছি না। সারাদিন নিজের হাতে খাবার করেছি। রামাবতারকে দিয়ে বিলিতি মদ আনিয়েছি। সন্ধ্যের অনেক আগেই সাজ গোজ শেষ। কিন্তু কোথাও যেন একটু স্বস্তি নেই। কী করলে একটু স্বস্তি পাই, তাও বুঝি না। আর একটা ভয়, রমণবাবু যদি জানতে

পারেন, তা হলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। উনি হৈ-হুল্লোড় লাগিয়ে দেবেন। কোন কারণে মেজাজ খারাপ থাকলে, ঢক করে খানিকটা মদ গিলে নিই। আজ সাহস পাচ্ছি না। আজকের অস্বস্তিও অন্য-রকম। রামাবতারটা আমাকে কোনদিন এরকম অবস্থায় দেখেনি। দেখে শুনে ও কী রকম বোকা বনে যাচ্ছে।

'দরজায় ঠক ঠক শব্দ হল। বুকটা ধক করে উঠল। দরজাটা ভেজিয়ে রেখেছিলাম। তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। পরিচিত, মুখ, কিন্তু অন্য মুখ। সে হেসে জিজ্ঞেস করল, "ব্যস্ত নাকি?" বললাম, "হ্যাঁ, আজ পারব না।" লোকটি চলে গেল। প্রায়ই আসে। নামটা মনে করতে পারলাম না। কেমন করে পারব। মনের কি কিছু আর আছে। তাকে খেয়ে বসে আছি। একটু পরেই রামাবতার ঘরে ঢুকে বলল, "একজন বাবু এসেছে।" আমি ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে, রজনীগন্ধার পাড় দেখেছিলাম। বললাম, "আজ আমার কোন বাবু চাই না। চলে যেতে বল্।" রামাবতার আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আমি বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, "আমিই দেখছি, তোকে বলতে হবে না কিছু।" দরজাটা খুলে, পর্দা সরিয়েই, আমি চমকে উঠলাম। ত্রিদিবেশ রায়! কী সর্বনাশ, আর একটু হলেই ফিরিয়ে দিচ্ছিলাম। যাঁর পথ চেয়ে বসে আছি, তাঁকেই বিদায়? বললাম, "আসুন।" উনি ঢুকলেন। আমি বালিস তাকিয়া সাজিয়ে রেখেছিলাম খাটের ওপর। বললাম, "বসুন।"

'ত্রিদিবেশবাবু বসলেন। আমি বোতল গেলাস সোডা ট্রে-তে সাজিয়ে ওঁর সামনে রাখলাম। উনি হেসে বললেন, "নিমন্ত্রণের কোন ত্রুটি রাখেননি দেখছি। এসব খাব, ধরেই রেখেছেন।" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "খাবেন না?" উনি বললেন, "আপনি দিচ্ছেন যখন, খাব নিশ্চয়ই। তবে না দিলেও ক্ষতি ছিল না।" বললাম, "একটু খান।" আমার নিজের জন্যও নিলাম। রামাবতারকে ডেকে,

খাবার গরম করে প্লেটে এনে দিতে বললাম। ওঁকে বললাম, "আজ আর আপনি আমাকে আপনি করে বলতে পারবেন না।"

ত্রিদিবেশবাবু হাসলেন, "আচ্ছা, তুমি করেই বলব।" আমি ওঁকে ছেলেবেলার ঘটনা বললাম। শুনে তিনি খুব অবাক হলেন। আমাদের পাড়াটার নাম বারে বারে জিজ্ঞেস করলেন। তারপরে বললেন "হ্যাঁ চিনতে পেরেছি।" আমার বাবার নাম বলতেও চিনতে পারলেন, তারপরে আমার দিকে যেন নতুন চোখে তাকালেন। জানতে চাইলেন আমি কী করে এপথে এলাম। আমি ওঁকে আমার জীবনের প্রথম ঘটনা বললাম, পীতুবাবুর বাগানবাড়ির কথা। শুনতে শুনতে মনে হল, উনি আর এ জগতে নেই, এ ঘরে নেই। চুপচাপ মদ খেতে লাগলেন। খাবার ছুঁলেন না। ওঁর চোখমুখ ক্রমাগত লাল হয়ে উঠতে লাগল। আমিও বেশ খেয়েছি। রাত্রি বারোটা বেজে গেছে। আমি বললাম "ত্রিদিবেশবাবু, খাবার গরম করে দিই, একটু খান।"

ত্রিদিবেশবাবু হাতের ঘড়ি দেখে, গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, না খাব না। আমি এবার যাব, অনেক রাত হয়েছে। ওঁকে যেন আমার ভিন্ন মানুষ মনে হল। সাহস করে যে হাত ধরব, থাকতে বলব, পারছি না। উনি খাট থেকে নেমে পকেট থেকে ব্যাগ বের করে, একটা একশো টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এটা রাখ।" মনে বড় কষ্ট পেলাম, সাপের ছোবলের মতন লাগল। বললাম, "আপনাকে আমি আজ নিমন্ত্রণ করেছি। উনি একটু হেসে বললেন, "গণিকার নিমন্ত্রণ। নাও, রাখ।" আমার কষ্টের মধ্যেই মাথায় আগুন ধরে গেল। নোটটা ওঁর হাত থেকে নিয়ে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেললাম। মেঝেয় ছড়িয়ে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে রাখলাম। আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছি না, আরো কী অনাসৃষ্টি করব। আমার মাথার ঠিক নেই!

'ত্রিদিবেশ রায় দেখলেন, বেরিয়ে চলে গেলেন। তারপরে যা

ঘটবার তাই ঘটল। আমি গেলাস বোতল চুরমার করে ভাঙতে আরম্ভ করলাম। শালা, তুমি সাহিত্যিক হয়েছ? আমাকে টাকা দেখাতে এসেছ। আবার বলে কী না, 'গণিকা।' সব ভেঙেচুরে ছিঁড়ে ফেলে দেব আজ। জানি না, কী করছিলাম, আমি তখন চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম না। কারা এসে আমাকে ধরেছিল, মাথায় জল দিয়েছিল, শুইয়ে দিয়েছিল। কেবল মনে আছে, বড় কষ্ট, বড় কান্না আমাকে যেন ছিঁড়ে ফেলতে চাইছিল।

'জিনিসপত্রের বা শরীর মনের ক্ষতি যা হবার হয়েছিল। কিন্তু জ্বালাটা ভুলতে পারছিলাম না। কয়েকটা দিন যেন সব সময়ে ভিতরে হু হু করে জ্বলছিল। রমণবাবুকে বলতে চেয়েছিলাম, আর একবার ত্রিদিবেশ রায়কে ডেকে আনবেন। বলতে পারিনি।

'মনের এমনি অবস্থায় পরের শুক্রবার সন্ধ্য সন্ধ্যেয় হঠাৎ ত্রিদিবেশ রায় এলেন। তখন আমি চুল বাঁধছিলাম। হাতদুটো যেন মাথা থেকে খসে পড়ে গেল। উনি পর্দা সরিয়ে বললেন, "আসব"? আমি নিজেই এগিয়ে গিয়ে বললাম, "আসুন।" নিজের আনন্দ দেখাতে সাহস পাচ্ছিলাম না, তাই হাসতে পারছিলাম না। তিনি ঢুকেই বললেন, "সেদিনের ব্যবহারের জন্য সত্যি বড় দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করে দিও।" আমি বললাম, "ও কিছু না। আপনি বসুন। আমি এখুনি আসছি।" বলে মীনাক্ষীর ঘরে ছুটে গেলাম। ওর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি চুল বাঁধলাম। মীনাক্ষী একটু ঠাট্টা বিদ্রূপ করল। জবাব দিতে পারলাম না। ফিরে এসে দেখি, ত্রিদিবেশবাবু একটা পত্রিকার পাতা উল্টোচ্ছেন। আমার শাড়ি জামা বদলানো ছিল। মুখে কিছু মাখিনি, আর মাখবার দরকার মনে করিনি। আমি রামাবতারকে ডাকলাম। ত্রিদিবেশবাবু বললেন, "আমি ওকে একটু পাঠিয়েছি।" কোথায় কী জন্য, জিজ্ঞেস করলাম না, বোধ হয় সিগারেট আনতে পাঠিয়েছেন। আমি মদ আনবার জন্য

'বুঝতে পারলাম, তিনি কী বলছেন। আমাদের এই বেশ্যালয়ের পরিবেশ তাঁর ভাল লাগে না। সে জন্য তাঁকে দোষ দিতে পারি না। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল, আমাকে তাঁর ভাল লাগে কিনা। জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না। হয়তো উনিই সত্যি কথা বলতে পারবেন না, ছেলে ভুলনো একটা কিছু বলবেন। তিনি আবার বললেন, বোতলের বস্তুর সদগতি করা যাক। আমার আজ একটু তাড়াও আছে। কথাটা বিশ্বাস হল না। বোধ হয় আমার সময়ের কথা ভেবেই বললেন। আমি লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি রামাবতারকে ডেকে, গেলাস আর সোডা দিতে বললাম। সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলাম, কেউ এলে যেন বলে দেয়, আমি ব্যস্ত আছি।

'তারপরে নিজের হাতে বোতল খুলে, গেলাসে ঢেলে, সোডা মিশিয়ে আগে ওঁকে দিলাম। উনি বললেন, "তুমি নেবে না?" বললাম, "না নিয়েই আমার ভাল লাগছে।" উনি বললেন, "তা হবে না। তোমাকেও একটু নিতে হবে।" আমার এত লজ্জা শরম কোথায় ছিল? জানি, এ বাড়ির মেয়েরা কেউ দেখলে, এটাকে একটা আমাদের স্বভাবজাত ছলনা মনে করত। ঈশ্বর জানেন, আমি তা ভেবে বলিনি। ত্রিদিবেশবাবু আমাদের জীবনটা মোটামুটি বোধ হয় জানেন। তাই অনায়াসেই মদ খাওয়ার কথা বলতে পারলেন। বাইরের সামনে যে সব মেয়েদের সঙ্গে উনি মেশেন, তাদের কি এভাবে মদ খেতে বলতে পারেন? তাঁর সম্পর্কে সারা দেশে নানান গল্প ছড়িয়ে আছে। মেয়েদের নিয়ে, তাঁকে জড়িয়ে, বহু গল্প লোকে বলে। আমার ঘরেই, লোকেরা কত গল্প বলেছে। আমি তাদের সঙ্গে তর্ক করেছি, তারা খুব খারাপ খারাপ কথা ওঁর নামে বলে।

'আমি আমার গেলাসে মদ ঢেলে সোডা মেশালাম। উনি গেলাস তুলে বললেন, তোমার জীবনের মঙ্গল কামনায়। বলে উনি চুমুক দিলেন, আমি চুমুক দিতে গিয়ে, থমকে গেলাম, আমার জীবনের

মঙ্গল ? আমার জীবনের আর মঙ্গল বলে কী আছে ? আমার জীবনে আছে কী ? বেশ্যাবৃত্তির মধ্যে মঙ্গল বলে কিছু নেই। উনি বললেন, কী হল থামলে যে ? আমি বললাম, আপনি মঙ্গলের কথা বললেন, তাই। আমার জীবনের মঙ্গল বলে কী থাকতে পারে ? উনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, দেখ বড় বড় কথা বলে কোন লাভ নেই। কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। অন্ততঃ নিজের কথা ভেবে বলতে পারি, এ জীবনে স্বস্তি আর শান্তি থাকতে পারে না। সুখ কথাটার কোন অর্থ নেই, কে কীভাবে পায়, বলা যায় না! তুমি একটা বিশেষ নামে চিহ্নিত হয়ে গেছ। কিন্তু আমাদের সমাজটাও নিষ্কলুষ নয়। ব্যাভিচার বলতে গেলে, সেখানেই চলছে। এখানে তো জীবন আর জীবিকার প্রশ্ন, সবটাই পরিষ্কার আর সহজ। তোমাদের অন্ন আজ আমাদের সমাজের বুকে ছিনতাই হচ্ছে। তার থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে, বহুকালের এই প্রাচীন ব্যবসার চেহারাটা বদলাতে বসেছে। আর দু একপুরুষ বাদে, মনে হয় না, এ রকম কোন লাল-বাতির এলাকা থাকবে না। তার মানে এই বলছি না, গোটা দেশটা লালবাতি এলাকা হয়ে যাবে। তবে গোটা সমাজের চেহারাটা বদলে যাবে। মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে, মূল্যবোধ বদলায়। এ কথাটা অনেকে মানতে চায় না।

'আমি ওঁর কোন কথাই প্রায় বুঝলাম না, কেবল তোমাদের অন্ন আজ তোমাদের সমাজের বুকে ছিনতাই হচ্ছে, সেটা আমিও জানি, অনেক কথা না বুঝলেও, আমি ওর কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনতে লাগলাম। আমি যে কথা ভাবি, সে কথা পুরোপুরি মনে রাখতে পারি! ছেলেবেলায় ইস্কুলে মাস্টারমশাইরা আমাকে তার জন্য বাহবা দিতেন। ত্রিদিবেশ বাবুর কথাগুলো বেশ মনে আছে। তিনি গেলাসে চুমুক দিয়ে বললেন, তোমার মঙ্গল কামনা করলাম, তোমার জীবনের জন্য। যে পথেই থাক তোমার শুভ হোক, এটাই চাই। কথাটা শুনে

কেন জানি না, বুকের মধ্যে টনটন করতে লাগল। তারপরে এক সময়ে, কখন থেকে আমি আমার নিজের কথা বলতে আরম্ভ করেছি, মনে নেই। আমার স্থাবর অস্থাবর, যা কিছু আছে, সব তাঁকে বলে দিলাম। আমার মনের কথাও তাঁকে বললাম, আমি এখানে থাকতে চাই না। কলকাতায় কোথাও একটা বাড়ি কিনে কোন রকমে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাই। উনি সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন, সেটা কি পারবে? সব জীবনের একটা মূল আছে, তার যা কিছু, সব সেখান থেকেই বাইরে ফুটে বেরোয়। তুমি যা বলছ, সে তো যোগিনীর জীবন। তা কি তোমার পক্ষে সম্ভব? আমি জিজ্ঞেস করলাম, যোগিনীর জীবন হবে কেন?

'ত্রিদিবেশ বললেন, আমি অবশ্য জানি না, তোমার আর কে আছে। তোমার মা আছেন বলেছিলে। আর কে আছেন? উনি কি বলছেন, বুঝতে পারলাম। বললাম, আর কেউ নেই। উনি বললেন, তবে? কী নিয়ে তোমার দিন কাটবে? আমার বলতে ইচ্ছা করল, আপনি যদি আমার সহায় হন, তা হলে আমার চিন্তা নেই। কিন্তু সে কথা বলা যায় না। উনি আবার বললেন, অবশ্য তোমার যদি একটা বিয়ে হয়, তা হলে সংসার জীবন নিয়ে থাকতে পার। বললাম, কে আমাকে বিয়ে করবে? উনি বললেন, তা ঠিক। আমাদের প্রগতিশীলতা আর বিপ্লব আবার অনেক প্রথা মেনে চলে। বলে হাসলেন, আবার বললেন, বল তো আমিই তোমার বিয়ের একটা সম্বন্ধ দেখি।

'আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম। ওঁর কতখানি আমেজ লেগেছে, জানি না। আমার এর মধ্যেই বেশ আমেজ লেগে গেছে। দু-বার হুইস্কি নিয়েছি। পা ঝুলিয়ে বসে, আমার পায়ের পাতা টনটন করছে। বললাম, আমি একটু পা তুলে বসি। উনি শশব্যস্ত হয়ে সরে গিয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাল হয়ে বস। আমি পা তুলে

বসলাম। একটি তাকিয়া আমাদের দুজনের মাঝখানে। আমার ভিতরে তখন সেই বাসনা, কেবলই আমাকে যেন তার নিজের পথে নিয়ে চলেছে। নতুন করে জীবন তৈরি করবার জন্য, আমি যেন আমার চারপাশে নতুন ভাবে আঁটঘাট বাঁধতে সঙ্কল্প করলাম, আমার বাকী জীবনটা, ত্রিদিবেশ রায়ের সঙ্গে মিশে যাক্ না কেন। তিনি কি তাঁর জীবনের ছিটেফোঁটা অংশ দিয়ে আমাকে বাঁচাতে পারেন না।

'এখন আমি যে জীবন কাটাচ্ছি, আমার এই পেশায় আমি ইচ্ছা করে আসি নি। আজ যদি নিজের ইচ্ছায়, অন্য জীবন পেতে চাই, তবে সেই চেষ্টাই কেন করি না। কিন্তু কেমন করে সেই চেষ্টা করব? নতুন জীবন বলতে, ত্রিদিবেশ রায়। আমি তাঁর সঙ্গে আমার জীবনকে বাঁধতে চাই। অমনি মনে হচ্ছে, এ যেন বামুনের চাঁদে হাত দেওয়া। কিন্তু যারা বামন নয়, তারা কি চাঁদে হাত দিতে পারে? পারে না। চাঁদে কেউ হাত দিতে পারে না। ত্রিদিবেশ রায় যে আমার কাছে চাঁদ। কেমন করে তাঁর জীবনে হাত দেব? দেওয়া কি যায় না? বাঙলাদেশের এত বড় লেখক ত্রিদিবেশ রায়, সোনাগাছিতে, তাঁর নিজের কথায়, একজন গণিকার ঘরে বসে আছেন, তার সঙ্গে বসে মদ খাচ্ছেন। এই তো অনেকখানি। গণিকার ঘরে বসে গণিকার বিছানায় বসে যদি মদ খেতে পারেন, তবে সেই গণিকার জীবনের সঙ্গে কি তিনি নিজেকে জড়াতে পারেন না? আমি তো তাঁর বউ হয়ে, এক সঙ্গে সংসার করতে চাই না। আমার যত টাকা আছে, সোনা আছে, সব তাঁকে দিয়ে দেব। দরকার হয় মফস্বল শহরে নতুন কেনা বাড়িটা বিক্রি করে দেব। তাঁর হাতে সব তুলে দেব। কী হবে আমার এই খাট আলমারি ড্রেসিং টেবিল, রেডিওগ্রাম রেকর্ড প্লেয়ার এসব রেখে? সব বিক্রি করে দেব। সব টাকা তাঁর হাতে তুলে দেব। তারপরে তিনি আমাকে যেভাবে

রাখবেন আমি সেইভাবে থাকব। শুধু তিনি আছেন, এটুকু জানলেই আমার হবে। তিনি আমার সব। আমার সঙ্গে তাঁকে থাকতে হবে না। কিন্তু আমার সব দায় দায়িত্ব তাঁর। তখন আমি মদ খাব না। তিনি মাঝে মধ্যে এসে আমাকে দেখেশুনে যাবেন। আমার ভাল মন্দ বিবেচনা করবেন। এ জীবন থেকে আমি মুক্তি পাব।

'ত্রিদিবেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, এত চুপচাপ বসে কি ভাবছ?

'আমি চমকে উঠলাম। নিজের কথা ভাবতে ভাবতে সব ভুলে গেছি। লজ্জা পেলাম। হেসে তাড়াতাড়ি একটা মিথ্যা বললাম, আপনার কথাটা ভাবছি।

তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কথা?

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, আপনার কথা মানে, আপনি আমার বিয়ের পাত্র দেখবেন, সেই কথাটাই ভাবছি।

তিনি হেসে উঠলেন, বললেন, কথাটা তোমার মনে ধরেছে তা হলে?

বললাম, তা বলতে পারেন। আমার যেন কেমন ঠাট্টা ঠাট্টা লাগছে। আমি জানি, পৃথিবীতে আমাকে কেউ বিয়ে করতে চাইবে না। তিনি গম্ভীর মুখে চুপ করে, কী যে ভাবতে লাগলেন। আমি হাসতে হাসতে আমার মনের কথাটা বললাম, বিয়ে করার দরকার নেই। কেউ যদি আমাকে এক ফোঁটা ভালবাসত তা হলেই আমি বর্তে যেতাম।

'কথাটা হাসতে হাসতে বললেও, বুকের মধ্যে কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। চোখ ছলছল করে উঠল। ভালবাসা কি, আমি জানি না। অথচ সেই ভালবাসা পাবার জন্যই কেমন একটা হাহাকার, বড় ক্ষুধা। আমার পোড়া কপাল। চেয়ে কি ভালবাসা পাওয়া যায়? যদি নিজের মন থেকে কেউ ভাল না বাসে।

'ত্রিদিবেশবাবু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, সংসারের প্রায় সকলের প্রাণের কথাটা তুমি এখানে বসে বললে। তোমার কথা আমি বুঝি।

'এই হলেন ত্রিদিবেশ রায়। লিখে যা বলেন, এখানে বসেও তাই বললেন। তাঁর লেখাতে বড় ভালবাসার ক্ষুধার কথা থাকে। তাই তাঁর লেখা ভাল লাগে। তিনি আমার কথা বোঝেন, এই শুনে, তাঁর দিকে আমার মন আরো বেশি করে টানছে। তিনি ছাড়া আমাকে কে বুঝবেন? কিন্তু সংসারের প্রায় সকলের প্রাণের কথা যদি আমি বলে থাকি, তিনিও কি তাদের একজন? তিনিও কি ভালবাসার কাঙাল? তা কেমন করে হয়? তাঁকে কত লোক ভালবাসে। কত মেয়ে ভালবাসে। তাঁর কেন ভালবাসার ক্ষুধা থাকবে? তাও আবার ভাবি ভালবাসার ক্ষুধার কথা তিনি জানলেন কেমন করে? লেখেন কেমন করে? মিছিমিছি করে লেখেন? তবে পড়তে পড়তে, সত্যি মনে হয় কেন? নিজের ক্ষুধার কথা মনে পড়ে কেন? কিন্তু সে কথা তো তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারি না। আমি তাঁর দিকে একবার তাকালাম। তিনি আমার দিকেই তাকিয়েছিলেন। আমি চোখের জল মুছি নি। অথচ লজ্জায় তখনই চোখ নামিয়ে নিলাম। স্পষ্ট দেখলাম, তাঁর দু চোখে কেমন কষ্ট ফুটে আছে। আমার চোখ একেবারে ভেসে গেল। হঠাৎ আমার মাথায় তাঁর হাতের ছোঁয়া পেলাম। হাজার পুরুষের ঘাঁটা আমার এই শরীর। কিন্তু এই ছোঁয়াটা একেবারে অন্যরকম। তাঁর কথা শুনতে পেলাম, দুঃখ যন্ত্রণা অপমান কী, আমার থেকে তুমি তা বেশি জান। কেঁদো না। আমাকে যদি বিশ্বাস কর, তা হলে একটা কথা মনে রেখ, তোমার মতন জীবন না কাটিয়েও, বেশির ভাগ মানুষ তোমার মতই দুঃখী। তোমার বিশেষত্ব এই, তোমাদের মত মেয়েদের সকলের এই দুঃখের অনুভূতি নেই। নানান কারণেই তাদের সেই অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায়, তোমার তা যায় নি। তবে গেলেই বোধ করি ভাল হত।

'আমি নিজেকে একটু সামলে জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তিনি বললেন, তোমার দুঃখই তাতে বাড়বে। বাড়িয়ে কী লাভ। তাঁর কথা যত শুনেছি, মনে মনে কেমন একটা আশা হচ্ছে, তিনি বোধ হয় আমাকে একটু ভালবেসেছেন। তাঁর চোখের কষ্টও যেন আমাকে তাই বলল। তিনি আমার মাথা থেকে হাত নামিয়ে, ঘড়ি দেখে

বললেন, অনেক রাত হয়েছে, এগারটা বাজে। আমি এবার উঠি
আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আর একটু বস্থন। খাবার তো কিছুই
খাওয়া হল না। বললেন, কিছু খাব না, বাড়ি গিয়ে খাব। বললাম
তা আর একটু হুইস্কি নিন। বলে আমি নিজেই ঢেলে দিলাম
সোডা মিশিয়ে দিয়ে বললাম, এখানে আসার কথা কি বাড়িতে
বলবেন? উনি হেসে বললেন, না। সবাই সব সহজ ভাবে নিতে
পারে না, বাইরে থেকে তাদের যাই মনে হোক।

'মনে মনে ভাবলাম, আমি যদি তাঁর বাড়িতে টেলিফোন করে
জানিয়ে দিই। তিনি বেশ্যা বাড়িতে এসেছেন, এ কথা তিনি
বলতে পারবেন না, অপমানে মাথা হেঁট করে থাকবেন
বললাম, যদি কখনো জানাজানি হয়? বললেন, তখন বলব। যা য
সত্যি, তাই বলব, কিন্তু সেই সত্যিটা কেউ বিশ্বাস করবে না। আমার
স্ত্রী সন্তানরা করবে না, বাইরের লোকও করবে না। উনি ঠিক
বলেছেন। আমি ওঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আবার আসবেন
তো? বললেন, দেখি সময় স্থযোগ পেলে আসব। জিজ্ঞেস করলাম
এখানে আসতে আপনার মনে কিছু হয় না? বললেন, হয়। তোমাকে
আজ এসেই তো বলেছি, ইচ্ছা করলেই নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া যায়
না। কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়েই আমি এখানে এসেছি। এখন আ
আমার মনে কিছু হচ্ছে না। তবে এর পরে তোমার এখানে আসতে
গেলেই, তোমার সময়ের কথা মনে পড়বে। বললাম আপনি কেবল
সময়ের কথাই বলছেন। সেটাই কি আমাদের কাছে সব? সময়ট
যেভাবে কাটে আপনি তো তা কিছুই করেন নি।

'কথাটা বলেই, লজ্জায় যেন মরে গেলাম। ওঁর দিকে তাকিয়ে
থাকতে পারলাম না। উনি গেলাস তুলে চুমুক দিতে যাচ্ছিলেন, থেমে
গেলেন। একটু পরে বললেন, না, তা করি নি। একটা কথা তোমাকে
বলি। আমি আমার স্ত্রী ছাড়া যে অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিশি নি, ত
না। কিন্তু টাকা দিয়ে, স্ত্রী দেহ কিনে, আমি কখনো তা ভোগ করতে
পারব না। ওটা দুজনের মনের আর শরীরের ব্যাপার। ওটা টাকা
দিয়ে হয়তো পাওয়া যায়, সে পাওয়ায় আমার বিতৃষ্ণা। আমার মন
শরীর কিছুই চায় না। বিবাহিত জীবনেও দেওয়া নেওয়া আছে তা

রূপ ভিন্ন। তার মানে এই নয় কি, বিবাহিত জীবনমাত্রের ওপরেই ামি শ্রদ্ধাশীল।

'তিনি থামলেন। আমার মনের মধ্যে তখন এক চিন্তা। আমি ্গা তাঁর কাছ থেকে টাকা চাই না। তিনি চাইলেই তো আমাকে াতে পারেন। তাঁর মন কি আমাকে চায় না? তাঁর শরীরে কি ামার জন্য কিছুই হয় না? তবে যে সবাই আমার রূপ নিয়ে এত কথা ্লে? আমার শরীরের দিকে তাকিয়ে, কত লোকের মরণ ধরে যায়। থ্যা বলব না, আমার নিজের মনেও একটু অহংকার আছে। আমাকে খে কেউ নিতান্ত বেশ্যা বলতে চায় না। সবাই বলে, আমার রূপ ার চেহারার মধ্যে একটা অন্য ছাপ আছে। অনেক সময় ভদ্র ঘরের য়েদের থেকে, অনেক বেশি সহবত মনে হয়। সত্যি আমি শিক্ষিতা ।। অনেকে মনে করে, আমি শিক্ষিতা। আমার কথাবার্তা চালচলনে কলেই সন্তুষ্ট। আমার একটু নেকনজর পাবার জন্য কত ভদ্রলোক হা রে আছে। বড় চাকুরে, ব্যবসায়ী, এমনকি কবি সাহিত্যিকও। াসলে আমি মেয়ে, তার ওপর বেশ্যা। অনেক ছলা কলা জানি। সে ব দিয়ে কি ত্রিদিবেশ রায়কে, আমার বশে আনতে পারি না? তিনি তা নিজের মুখেই স্বীকার করলেন, অন্য মেয়েদের সঙ্গেও তিনি মিশেছেন। আমি কি তাঁকে আমার সঙ্গে মেশাতে পারি না?

'আমি তাঁর দিকে তাকালাম। তিনিও তাকালেন। তাঁর চোখ মুখ লাল। মুখ ঠোঁট সবই লাল। আমি ঠোঁট টিপে হেসে, মুখ ামালাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী? আমি মাথা নেড়ে বললাম, কিছু না। আপনার কথাই ভাবছি। বলে, একটু পাশ ফেরবার ভান করে, বুকের আঁচল নামিয়ে দিলাম, আবার যেভাবে বসেছিলাম, সেই ভাবে বসলাম। উনি জিজ্ঞেস করলেন, আমার কী কথা? বললাম, ওই যে বলছিলেন, দুজনের মন আর শরীরের ব্যাপার। সেই কথা বলে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে। তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার কী রকম ভয় করে উঠল। তিনি আমার আঁচল খসান ছলনা বুঝতে পারেন নি তো? আমি তাড়াতাড়ি আঁচলটা আবার বুকের ওপর টেনে দিলাম। কী করব, এ সব যে আমার এখন মজ্জাগত হয়ে গেছে। শরীর দিয়ে ছলনা

আর চাতুরি। তিনি বললেন, তোমার হয়তো সে অভিজ্ঞতা কোনদি
হয়নি। তার জন্য তোমাকে দোষ দেব না।

আমি একথা বৃথা যেতে দিলাম না। বললাম কেমন করে আমা
সে অভিজ্ঞতা হবে? আমি চাইলেই কি সে অভিজ্ঞতা হতে পারে
তিনি একটু হেসে বললেন, তুমি চাইলে নিশ্চয়ই হতে পারত। কি
তোমার জীবনে বোধ হয় সে সুযোগ কোনদিন আসে নি। আ
তাঁর দিকে তাকিয়ে, চোখ নামালাম। আবার তাকালাম। বললা
সুযোগ পেলেও, আমি তা পাব কেমন করে? তিনি বললেন, সুযো
যদি আসে, তা হলে কেমন করে পেতে হয়, সেটা বলে দিতে হয় না
দুজনে বুঝে নেয়।

বুঝলাম, তিনি এখন আর আমার দিকে তাকিয়ে নেই। গেলা
শেষ করে বললেন, আর দেরি করব না, এবার উঠি। কিন্তু তোমা
সময় এভাবে নষ্ট করতে সত্যি আমার খারাপ লাগছে। তুমি দ
করে টাকাটা রাখ। আবার সেই টাকার কথা? তিনি বুঝি কিছুতে
আমাকে অন্য চোখে দেখতে পারছেন না? আমাকে যে একটি মে
হিসাবে তাঁর ভাল লাগে নি, তাও বুঝতে পারলাম। মনে বড় লাগল
কিন্তু কিছুই করার নেই। আমি কিছু না ভেবেই বলে ফেললাম, বে
এ টাকা দিয়ে আপনি রুণকিকে কিছু কিনে দেবেন।

বলেই দেখি ত্রিদিবেশবাবুর মুখটা আগুনের মতন জ্বলছে। তাঁ
হাতে কতগুলো দশ টাকার নোট। বললেন, কী বললে? তোমা
যে টাকা দিতে চেয়েছি, সে টাকা দিয়ে আমি আমার মেয়েকে কি
কিনে দেব? তোমার সাহস তো কম না? বলেই নোটগুলো খাটে
ওপর ছুঁড়ে দিয়ে, খাট থেকে নেমে, দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন
দরজা খুলে বেরিয়ে যাবার আগে, রাগে আর ঘৃণায় আর একবা
আমার দিকে ফিরে বললেন তুমি কী, তা ভুলে যেও না। বলে
বেরিয়ে গেলেন। আমি পাথরের মতন বসে রইলাম। আর মনে ম
বলতে লাগলাম, ছি, ছি, কেন একথা বলতে গেলাম। কিন্তু আ
তো খারাপ ভেবে কিছু বলিনি। ওঁর রেগে যাবার একমাত্র কার
আমি বেশ্যা। ওর কথায় গণিকা। উনি সাহিত্যিক, উনি ভদ্রলোক
গণিকাকে দিতে চাওয়া টাকা দিয়ে নিজের মেয়েকে কেমন করে কি

দেবেন ? তবু গণিকা বলার জন্য আজ নিজেই না দুঃখ করছিলেন ? ভাবতে ভাবতে মাথাটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। বোতল তুলে কাঁচা হুইস্কি গলায় ঢালতে লাগলাম, মুখে যা আসতে লাগল তাই বলতে লাগলাম, শালা সাহিত্যিকগিরি দেখাতে এসেছ ? আবার নিজের মুখে বলা হল, বউ ছাড়া অন্য মেয়েদের সঙ্গে মেশো। সে সব খুব ভাল, না ? ভদ্দর লোক। মুখে মারি ঝাড়ু অমন ভদ্দরলোকের।

কত কি বলেছিলাম জানি না। রামাবতার এসে আমাকে থামাতে চেয়েছিল। সেই আমি প্রথম গেলাস বোতল ভেঙ্গে চুরমার করেছিলাম। বুঝেছিলাম, অন্য মেয়েরা কখন কেন চিৎকার করে, ভাঙচুর করে। কিন্তু রাত পোহাতে অনুশোচনায় সরে গেছলাম। হায় হায় কেন মরতে আমার মুখ দিয়ে সেই কথা বেরিয়েছিল। আগেরবার টাকা ছিঁড়েছিলাম বলে রাগ করেছিলেন। এবারে মেয়ের কথায় তাঁর লেগেছে। এর পরে আর তিনি কোনদিনই আসবেন না। সত্যিই তো আমি ভুললাম কেমন করে, কার সঙ্গে কথা বলছি, কার মেয়ের কথা বলছি ? আমি নিজের পায়ে কুড়োল মেরেছি। আমি পেয়ে হারিয়েছি। কিন্তু এই ভেবে তো সব শেষ করতে পারি না। আমার পোড়ানি ধরেছে যে। তাই যার মারফৎ তাঁকে প্রথম এখানে পেয়েছিলাম তাঁকে ধরলাম, যদি একদিন ধরে আনতে পারেন। তিনি বললেন, চেষ্টা করবেন, তবে কঠিন ব্যাপার, তাঁর দেখা পাওয়া ভার।

তবু আশায় আশায় বেশ কিছুদিন কাটালাম। তিনি এলেন না। তাঁর টেলিফোন নম্বর জানি, তাঁর ঠিকানা জানি। সাহস পেলাম না কিছু করতে। সবাই বলল, আমার মদ খাওয়ার অবস্থা বেড়ে যাচ্ছে। নিজে বুঝতে পারলাম না। মা এলে, কথা বলতে ইচ্ছা করত না। ভাল ভাল লোকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করেছিলাম। তারপরে একদিন বিনা মেঘে জল এল। তিন মাস পরে, ত্রিদিবেশ রায় হঠাৎ একদিন এলেন, চুর চুর মাতাল। মানুষ চিনতে পারেন না। রাত্রি তখন প্রায় বারোটা। রামাবতার আমার খাবার গরম করছিল। আমিও আর লোক বসাব না বলে, মাথার চুল খুলে আঁচড়াচ্ছিলাম, আর একটু মদ খাচ্ছিলাম। তিনি দরজা খুলে ঢুকে সারা ঘরের দিকে তাকালেন। বেশ টলছেন।

চোখ টকটকে লাল। কোঁচা লুটোচ্ছে। কোথা থেকে এসেছিলেন, কে জানে। আমি চিরুণি ফেলে দিয়ে, তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, বিজলি? আমি মাথা ঝাঁকালাম। তিনি বললেন, অন্যায়—ক্ষমা কর। বলেই ফিরতে গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর হাত চেপে ধরলাম। বললাম, এভাবে কোথাও যাবেন না। তিনি আমার দিকে ফিরলেন, আমার গায়ে ঢলে পড়লেন। কিছু বলতে গেলেন, পারলেন না। আমি ওঁকে জড়িয়ে ধরলাম, খাটের কাছে টেনে নিয়ে বসাতেই তিনি এলিয়ে পড়লেন। আমি রামাবতারকে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার ইশারা করলাম। সে বেরিয়ে যেতেই, আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম। তাড়াতাড়ি ওঁর কাছে গিয়ে, পা থেকে জুতো জোড়া খুলে, ভাল করে শুইয়ে দিলাম। তিনি যেন কী বিড়বিড় করছিলেন। আমি তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়ে, দু' হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাঁকে চুমো খেলাম। তিনি চোখ খুললেন না, আমাকে দু' হাতে জড়িয়ে টেনে নিলেন।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে তিনি কিছুই মনে করতে পারেন নি। কথা শুনে বুঝেছিলাম, তিনি আমার কাছে আসবেন বলেই আসেন নি। তবে স্বীকার করেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই ড্রাইভারকে এই রাস্তায় আসতে বলেছিলেন। আর নিজে থেকেই আমার ঘরে এসেছিলেন। বলেছিলেন, মনে মনে তিনি অনেকদিনই আমার কাছে আসবার কথা ভেবেছেন, আসতে পারেন নি। রুণকির কথার ব্যাপারে ক্ষমা চেয়ে বলেছিলেন, আবার সেই কথাই বলি, নিজেকে আমরা সব সময় ছাড়িয়ে যেতে পারি না। তুমি কী বলেছিলে বা চেয়েছিলে, তাতে আমার মেয়ের কিছুই যায় আসে না। ওসব আমার বাড়াবাড়ি। আসলে আমি আমার স্ত্রী পুত্র ছেলেমেয়েদের কাছেই বা কতটুকু পরিচিত?

তারপরের রোজ দিনের কথা যদি লিখি, সে এক মহাভারত। নতুন কথা কিছু না। আমাদের লাইনে, অনেক মেয়ের জীবনে এমন ঘটেছে। তফাৎ কেবল, তাদের জীবনে ত্রিদিবেশ রায় আসেন নি। সেই ঘটনার পর থেকে ত্রিদিবেশ রায় প্রায়ই আমার কাছে আসতেন। যা আমি চেয়েছিলাম। ফলে যা হয়। আমার রোজ বলতে আর কিছু, কেউ ছিল না। তিনি রোজ আসতেন না, প্রায়ই

আসতেন, কিন্তু আমি রোজই তাঁর পথ চেয়ে বসে থাকতাম। ফলে, কারোকে ঘরে বসাতাম না। তিনি তাঁর সম্পাদক প্রকাশক সাহিত্যিক বন্ধুদের নিয়েও মাঝে মাঝে আসতেন। সবাই আমাকে সাবধান করেছিল, মা রাগারাগি করত, আমার ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। আমি তো তখন অন্য জীবনের স্বপ্নে বিভোর।

আমার স্বপ্নের কথা তাঁকে বলেছিলাম। তিনি ঘোরতর আপত্তি করেছিলেন, তা কখনো সম্ভব না। তার নিজের সম্মানের জন্য না, আমি নাকি নিজেই কখনো তা পারব না, এই তাঁর বিশ্বাস। এ ব্যাপার নিয়ে, আমি ক্ষেপে যেতাম। মদ খেয়ে, চিৎকার চেঁচামেচি করে জিনিসপত্র ভেঙেচুরে, টাকা পয়সা গহণা সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ডকারখানা করতাম। তবু তিনি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। আমি বুঝতাম না। মাথা ঠুকে রক্ত বের করতাম, তাঁকে যা তা গালাগালি করতাম। তারপর থেকে, তিনিও বদলে যেতে শুরু করেছিলেন। ক্ষেপে যেতেন, চিৎকার করতেন। হায় হায়, তখনকার সেই রাত্রিগুলোতে তাঁর দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখি নি, তাঁকে আমি কোথায় নামিয়েছি। তাকিয়ে দেখি নি, ত্রিদিবেশ রায়ের মূর্তি কী দাঁড়িয়েছে।

তখন কলকাতায় আর কান পাতবার উপায় নেই। সকলের কাছেই ব্যাপার জানাজানি হয়ে গেছল। কিন্তু তার জন্য, তাঁর কিছু যায় আসে নি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি নিজেই সরে গেছলেন। সর্বনাশকে তিনিই দেখতে পেয়েছিলেন, আমি না। তা না হলে, তিনি তো আমার সর্বস্ব নিয়ে চলে যেতে পারতেন। ঘটেছিলও তাই। তাঁর চলে যাওয়ার পরে, যখন তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজছি তখন একজন আমার জীবনে এসেছিল। সে বড়লোক, ভদ্রলোক, সজ্জন, দেখতেও সুন্দর। তাকে আমি আমার স্বপ্নের কথা বলেছিলাম। সে রাজী হয়েছিল। রাজী হওয়ার কারণ, তার স্ত্রীর সঙ্গে গোলমাল চলছিল। সে আমার জন্য কলকাতার ভাল জায়গায় বাড়ী কিনে আমাকে সেখানে নিয়ে গেছল। মনে করেছিলাম, যা চেয়েছিলাম, তা পেলাম, ত্রিদিবেশ রায়ের ওপর প্রতিশোধও নিতে পারলাম।

বড় ভুল বুঝেছিলাম। সেই লোকটি আমাকে ঠকায় নি, আমার

একটি পয়সাও সে নেয়নি, বরং দিয়েছে। কিন্তু তার মোহ ঘোচবার পরে, সে আমাকে ছেড়ে গেছল। আমার পক্ষে একলা সেই বাড়িতেও থাকা সম্ভব ছিল না। আবার সেই পুরনো জায়গাতেই ফিরে আসতে হল। ফিরে এলাম বটে, কিন্তু আমি আর সেই বিজলি নেই। এতদিন বোতল গেলাস আসবাবপত্র ভেঙেছি, এখন নিজেই ভেঙেচুরে গেছি। ত্রিদিবেশ রায় তাঁর নিজের জীবনে ঠিকই চলছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কী ঘটতে চলেছে। যতই ধূলা কাদা মাখুন, সময় মতন ধূলা থেকে উঠতে পেরেছিলেন। আর আমি যেখানে, সেখান থেকেও, অন্য জায়গায় চলে গেছি।

কেউ কারোর জীবন কেড়ে নিতে পারে না। আমারটা কেউ পারে না। আমি কারোরটা পারি না। তবু তো তাঁকে কিছুদিনের জন্য পেয়েছিলাম। তিনি কি কখনো আমার কথা লিখবেন? কে জানে। সেই আমি নুড়ি, হরিমতী যার ভাল নাম, আর বেশ্যা নাম বিজলি। নিজের প্রথম অবস্থা থেকে, কোন দিন কি ভেবেছিলাম, জীবনে এমন ঘটনাও ঘটবে? ভাবি নি। এখন ভাবি, আর কতদিন? আর কতদিন এ জীবন কাটাতে হবে? জানি, এখন আর নিজের ইচ্ছাই কিছু হবার নয়। যা হবার, তা এ জীবনের যে নিয়তি, সে-ই আমাকে তার পথে টেনে নিয়ে যাবে।'

তারপরেও খাতায় আরো কিছু পাতা লেখা আছে। কিছু ঘটনা, কিছু ব্যক্তির কথা। তার মধ্যে, ত্রিদিবেশ রায়ের বন্ধুদের কথাও আছে, যাঁরা পরবর্তীকালে, বিজলীর কাছে এসেছে। কিন্তু সেসব ঘটনার রঙ রস ঔজ্জ্বল্য অত্যন্ত নিষ্প্রভ। স্মৃতিমন্থন ছাড়া আর কিছু না। খাতার লেখার শেষ বলে কিছু নেই। খাতা পড়ে বোঝবার উপায় নেই, খাতার লেখিকা আজ কোথায়, কী তার জীবনের পরিণতি ঘটেছে। কেবল তার জীবনে একটিই ঐতিহাসিক অধ্যায়, ত্রিদিবেশ রায়। তাকে কেউ না জানুক, ত্রিদিবেশ রায়কে দেশের লোক চেনে জানে। তিনি হয় তো জানেনও না, তাঁর কথায়, একটি 'গণিকা'-এর নিজের হাতের লেখায়, তিনি আর একরূপে প্রতিভাত হয়ে আছেন।

খাতাটি পড়ে আমার মনে হচ্ছে, এ যেন নিজের আয়নায় নিজেরই মুখ দেখা। খাতাটা পড়ে একটুকু জানলাম, কত কম জানি, কত কম দেখেছি, আর জীবনের কত যন্ত্রণা কষ্ট, আমাদের অজানা রয়ে গিয়েছে।